মরু বারি তৃষা

অরুণ মৌলিক

মনোরমা
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

MARU BARI TRISA

প্রকাশক
সুকুমার সাহা
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

গ্রন্থস্বত্ব
দীপক মৌলিক

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬৩
পৌষ ১৩৭০

প্রচ্ছদশিল্পী
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
পরেশ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

নিত্য দিনের ব্যস্তবহুল কর্মকোলাহলে

পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব-ঘায়ে

যারা সিক্ত-রিক্ত

সেইসব নরনারী-দম্পতিদের করকমলে

নিবেদিত হল এ গ্রন্থখানি।

অল্প-স্বল্প ইচ্ছা-সামর্থ্য সম্বল করে লেখালেখির দিকে এগিয়েছিলাম কিশোর বয়সেই। অনীহা জাগিয়ে তুলেছিল পদে পদে—বাধা-বিঘ্ন, প্রতিকূলতা। সাহিত্য-অঙ্গনে ঘুরপাক দিতে দিতে জুটেছে কত-না উৎসাহ কত-না নিরুৎসাহ। 'তরুণ বয়সে লিখো না হে, ভাবপ্রবণতা কাটাতে আগে।'—এ ছিল ছেড়ে-আসা বজ্রযোগিনী গ্রামের সাংবাদিক-সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর বজ্রনাদ—আমার মাথায় যা বজ্রের মতোই এসে পড়ে। আমাকে দেয় দমিয়ে। সময়কালে, অর্থাৎ তারুণ্য কাটিয়ে পরবর্তীতে লেখার বাসনা রেখে তখনকার মতন হাত গুটিয়ে ফেলি। আশা-উৎসাহের মাঝে নেমে আসে নিরাশা। ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্বেষণে নামতে হয় জীবনযুদ্ধের সংগ্রামে।

এক সময় যা-কিছু লিখেছিলাম অযত্নে-অবহেলায় সে-সব এধার ওধার হয়ে যায়। ছেপে বেরবার সুযোগ পায় কয়েকটি ছোটগল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—ঔপন্যাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি গোপাল ভৌমিক, সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের সহযোগিতায়। একদা যাঁরা আমাকে চেয়েছিলেন লেখক হিসাবে পেতে কবেই তো তাঁরা কাটিয়েছেন ইহলোকের মায়া। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি দাদু সম্পর্কিত ঔপন্যাসিক-নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজতন্ত্রী নেতা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতৃদেব শিক্ষাবিদ রাখালচন্দ্র মৌলিককে। তাঁদের অনুপ্রেরণাই আমার লেখনীর মূল উৎস। বিস্মৃত হতে পারছি না আমার প্রথম রচিত উপন্যাস পড়ে যিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, সেই কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একদিন তিনি অনায়াসে বুকে টেনে নিয়েছিলেন এই খুদে লেখকটিকে। বলেছিলেন—"পথের মাঝে লোক চলাচল দেখবে আর তুমি লিখবে তাদের দেখে দেখে।"

কালস্রোতে হারিয়ে যায় যে দিনগুলি তা আর আসে না ফিরে। থাকে কিছু ঘটনা যা কিছু ফেলা যায় না।

সবকিছুই বদলায়; মানুষও বদলায়। এক-এক সময় মানুষ হয়ে ওঠে অবিবেকী-অমানুষ। হারায় বোধগম্যি; বুঝতে চায় না আপন

ভাল-মন্দ। মন থেকে উবে যায় স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার কথা, স্বার্থের কথাটা ব্যতীত ভাবে না সে। চলে হেঁটে-ছুটে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধের মতো। প্রশ্ন শুধু পাওয়া-না-পাওয়াই। জল-জল বলে মরীচিকার পেছনেই তার ছোটা। 'মরু বারি তৃষা'-র প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র সেই তৃষিত অন্তরেরই পাওয়া না-পাওয়ার আর্তি, হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি—আজকের সমাজ দর্পণের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপটে। সে প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়েছে জানি না। রচনার দোষ-ত্রুটির দায়ভার আমারই। গুণাগুণ বিচারের ভার আমার নয়।

পরিশেষে জানাই, বারংবার নানাভাবে ঘা খেতে খেতে লেখক জীবন যখন সাঙ্গ হতে চলেছিল এমন সময়ই আমার 'মরু বারি তৃষা' অতি যত্ন সহকারে প্রকাশ করে আমাকে সুধী পাঠক মহলে পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন 'মনোরমা' প্রকাশনা সংস্থার শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সাহা এবং সাহিত্যিক শ্রীনীরেন দাস, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অরুণ মৌলিক

১০৪ বি. টি. রোড
বনহুগলী
কলকাতা-৭০০০৩৫

মরু বারি তৃষা

অনিচ্ছকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
১৯	১৮	নেব	নেন
২০	৬	অফিসও	অফিস
২৪	১০	ফেলতেন	ফেলবেন
২৪	১৬	খাবে	খাটবে
২৬	৪	অর্ধকুলা	অর্ঘকুলা
২৯	৩	ষারা	যারা
৩৫	১৯	তোমার	তোমায়
৩৬	১৯	ভাতলে	ভাতল
৩৭	২৬	ষন	থন
৪০	৮	হাত	হত

জন্মলগ্নে জনদশেক কর্মচারী ও একজন স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে যার গোড়াপত্তন, সামান্য সময়ে এ ভাবে যে তার বিস্তৃতি ব্যাপ্তি ঘটবে ভাবা যায় নি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সে চার ও পাঁচের দশকে, সামিল হয়েছিল বৃহৎ বিপুল কর্মযজ্ঞে—জঙ্গল-কাটা, খানা-খন্দ বোজানো ছাড়াও শরণার্থী উদ্বাস্তুদের জুগিয়েছিল আস্তানা—গড়ে তুলেছিল বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, নতুন নতুন শিল্প উপনগরী—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমষ্টি-উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকেও করেছিল রূপায়িত।

সে-সব তো কবেকারই কথা। কজনে তা জানে? আজ সে রামও নেই, সে অঁযোধ্যাও নেই—জোয়ারে নেমেছে ভাটা।

শহর কলকাতাতেই সেই উন্নয়ন তথা নির্মাণ কুশলী বিভাগের বেশ কয়েকটি অফিস-দপ্তর, যাঁয় সদর দপ্তরও। সদর দপ্তরে রয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী—করণিক, স্টেনো, টাইপিস্ট, ড্রাফটসম্যান, মোহরার, গ্রুপ ডি কর্মী, ছোট-বড়-মাঝারি ইঞ্জিনিয়ার। প্রয়োজন বোধে ইঞ্জিনিয়াররা ওয়ার্ক সাইটে যান নির্মাণকার্য তদারকি করতে। 'উপরি' দুটো পয়সা আছে ওয়ার্কসাইটে ভারপ্রাপ্তদের অনেক কথার সঙ্গে এ কথাটা হাওয়া বাতাসেই ভেসে বেড়ায়।

সরাসরি যাঁরা যুক্ত নন ওইসব কাণ্ড-ক্রিয়ার সঙ্গে—অফিসেই বসেন তাঁরা। তাঁদের জনকয়েকের আচার-আচরণ, দায়-দায়িত্বহীনতার কথাও নেই অজানিত-অবিদিত। যাঁর যেটা নজরে পড়ে তাই-ই তিনি বলেন। এক-এক সময় অফিসটা হয়ে ওঠে এক আজব ক্রীড়া-ভূমি। রঙ্গক্রীড়ায় যোগ দেন তরুণ নয় তো বরুণ, বরুণ নয় তো নরারুণ অথবা অমলেশ-হৃষিকেশ-পুলকেশরা। ফাল্গুনী-বন্দনা-অর্পিতারা কথা বলার লোক যত বেলা না পান বসে বসে উল বোনেন। একটা

গল্পের বই মেলা থাকে সামনে। সেদিকে নজর রাখেন, চুমুকও দেন চায়ের পেয়ালাতে।

যত না কাজ চতুর্গুণ তার র‍্যালা, আয়েস, আড়ম্বর। হেলতে-দুলতে বিলম্বে পৌঁছন এসে অফিসে। পাঁচদিন লেট করলে একদিনের ছুটি কেটে নেবার নিয়ম, তা-ও তো কাটা হচ্ছে না, এঁদের চাড় নেই কোনও ব্যাপারে; অফিসারদেরও নেই কড়াক্কড়।

অফিসে এসে টেবিলের কিনারে বসা, ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং চড়ানো। অন্যদের সঙ্গে গুলতানি, সাময়িক প্রসঙ্গ, রাজনীতি, খেলাধূলা, সিনেমা বিষয়ক কাগুজে-খবর সূত্রে খানিকটা বাদানুবাদ, দ্বিতীয় দফা সংবাদপত্র পাঠ। পুনর্বার আলোচনা, নিজেকে বোদ্ধা-বুদ্ধিমন্ত প্রমাণিত করবার প্রবণতা কারও না-কারও থাকে।

মেয়ে-মহিলারা ঠেকনা দিয়ে বসেন চেয়ারের হাতলে, চড়েন টেবিলেও। নিজেদের মধ্যে বকবকানি সেরে এগোন পুরুষদের আড্ডায়।

একদিকে মধ্যবয়সী বয়স্করা। অন্য দিকে নব্য-নবীনদের চড়া-ভারিক্কি গলার জটলা, শ্রোতা অপেক্ষা বক্তা বেশি।

প্রথমে বিহার এবং পরে উত্তর কাশীর ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতি, উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সফলতা, পঞ্জাবের গণহত্যা, কলকাতায় গোলযোগ, জনতা পুলিশে খণ্ড-লড়াই, গুলি, সাম্প্রতিক বন্ধ থেকে মশক নিধনও স্থান করে নেয় বয়স্কমহলের আলোচ্যসূচীতে।

বাঙাল-টানে কে যেন বলে উঠলেন—'কাউলকা দেখছি দোকান-বাজারের ঝাঁপ ফেলা। রাস্তায় হাডুডু ব্যাটবল খ্যালাইছে পোলা-পানে। অথচ বিরোধী পক্ষ কইত্যাছে বন্ধ ব্যর্থ।'

কেউ বললেন, 'আরে দাদা, যাঁদের হাতে ঢাল-তলোয়ার তাঁদের ডাকা বন্ধ ব্যর্থ হবে কেন।'

অন্য একজন বললেন—'মাঝখান থেকে সদাশয় সরকার একটা দিন ছুটি পাইয়ে দিলেন।'

কেউ প্রশ্ন তুললেন—'দাদা, কাল সারাদিন কী করে কাটালেন বাড়িতে ?'

জবাব এল—'জব্বর ঘুমাইছি। তাসও খ্যালাইছি বৈকালের দিকটায়। যা অতিষ্ঠ কইরা তোলছে মশা মাছি। অহোরাত্র হনহন ভন ভন। হুল বিদ্ধ কইরা মশায় তো গাও-হাত-ফুলাইয়া দিছে। মশা-মাছিরে খতম করতে পৌর সভা কবে যে কামান ফিট করবো।'

—'মশা মারতে এখন কামান দাগতেই বাকি! কত শোনা গেছে আর কত না শুনব। কথার সাগর এক-একজন, কবি বলে গেছেন 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতা আছি'—বেঁচে থাকলে কবিপ্রবর ভিন্ন অবস্থা দেখতে পেতেন।'

—'যে যাই বল, কলকেতায় মশা-মাছি কম। গাঁ-গঞ্জে ওদের বাজারটা আরও রমরমা।'

পিছন থেকে কে এসে বক্তার কাঁধে হাত রাখলেন—'এই যে ভাই, মাছি-মারা কেরানি। লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলে গেলে কেন! হচ্ছিল তো বন্ধ নিয়ে। বল তো কজনের প্রাণ কেড়ে নিল এই বন্ধ? বন্ধ বিরোধী হামলায় বলি অন্তত তিনজন, 'বেলঘরিয়ায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু'—'রিক্‌শাতেই সন্তান প্রসব'—'জীবন সঙ্কট প্রসূতি মায়ের।' পড়ে দেখো হে খবরগুলো।'

—'ও-সব তো হয়ে থাকে, হবেও; এদিকে আমাদের যে বন্ধের জের সামলাতেই প্রাণান্ত। বাজারের হাল টের পাচ্ছেন?'

একজনে জবাব দিলেন—'ব্যামালুম ট্যার পাইত্যাছি। মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ভাইকা বাজারটারে কইরা ফ্যাল্লো আগুন।'

টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন কেউ—'ঠিকই বলেছেন দাদা বন্ধের 'সাফল্য'টা তা হলে বুঝছেন? কার না ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এ বন্ধে বলতে পারেন? ভেবেছেন কি একবার দিন-আনা, দিন-খাওয়া—'

আলোচনায় ছেদ পড়ল। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের আর্দালী পবননন্দন দেখা দিলেন—'সাহেবো চটি গেছেন, আস্তে কোথা বলুন।'

ওদিকটায় জোরালো কণ্ঠে বাগ্মিতা ফলাচ্ছিলেন তরুণ মহলও। তাতে যোগ দিয়েছিলেন মেয়েরাও, তর্কেও নিয়েছিলেন অংশ, বিষয় রাজ্য রাজনীতি ও দলীয় কোন্দল। তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যেও লেগে গেল কোন্দল।

পবননন্দন যেতে না যেতে বড়বাবুও এলেন এগিয়ে—'হচ্ছেটা কি! অফিসটাকে বৈঠকখানা বানিয়ে ফেললেন যে! দেখতে পাচ্ছি একটা লাউডস্পীকার আনিয়ে দিতে হবে আপনাদের, সেই সঙ্গে উঁচু লম্বা খান কয়েক চেয়ারও তো চাই।'

লজ্জিত হলেন দু-একজন। হাসলেন সলজ্জ হাসি, টেবিল থেকে নামলেন না বড় কেউ। বড়বাবু যত না ধমকালেন, রসিকতা করলেন তার চেয়ে বেশি, পরোক্ষে লাই দেওয়াই হল।

শাসক শাসন করেন না। সময় সময় দেন নাটকের মহড়া। পার্টটা ভুল হয়ে না যায় তাই মকশ করেন।

বড়বাবুর উদ্দেশ্যে কেউ শ্লেষোক্তি করেন—'আমরা গলা চড়ালেই মহাভারত অশুদ্ধ। আর ইউনিয়নের লোকেরা বিপ্লবের বুলি আউড়ে চেল্লাচেলি করে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটালে এঁরা কানে তুলো দিয়ে থাকেন।'

গটগটিয়ে সীটে চলে যান বড়বাবু কথা-কথান্তরে না থেকে।

বকতে বকতে গলা শুকিয়ে খটখটে. জলপান, চা-সহযোগে ধূমপান! মশলা দেওয়া পানের খিলি চিবোতে চিবোতে টেবিল থেকে গুটি গুটি নামা। গাম্ভীর্য সহকারে চেয়ার টেনে বসা, ফাইল 'স্পর্শ' করা, ফাইলের গিঁট খোলা, গিঁট মারা। নোট শীটে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে বাঁ-দিকের ফাইল ডানদিকে, ডানদিকের ফাইল বাঁ দিকে আনা, সামনের ফাইল পিছনকার র‍্যাকে। র‍্যাক থেকে ফাইল টেবিলে এনে জগাখিচুড়ি পাকানো হয় এমনই যে কেউ কোনও ফাইল চাইলে চট করে পাওয়া যায় না, দেওয়া যায় না। এর নাম কাজ দেখাবার কারসাজি। খোঁজাখুঁজির অছিলায় চালে-ধানে মিশিয়ে ধান বাছা।

সদর দপ্তরে বা হেড অফিসে মানুষজন আসে দরকারে-দরবারে। আসেন মফস্বলের কর্মী, ঠিকাদার। একজন দেখান অন্যজনকে, রাম দেখান শ্যামকে। শ্যাম দেখিয়ে দেন যদুকে। একে একে সবার কাছে ঘুরে-ফিরে শেষতক রামেরই শরণ নিতে হয়। করজোড়ে বলতে হয়—'কাজটা তো আপনাকেই করতে হবে স্যার।'

রাম আমতা আমতা করেন—'ফাইলটা পাইনি, দেখিনি। আচ্ছা বলছেন যখন দেখব।'

—'কেসটা যত সত্বর করে দেখবেন ততই উপকৃত হব। হাতে হাতে চিঠিটা নিয়ে যাব বলে কষ্ট করে ছুটে এসেছিলাম স্যার।'

—'তা আমি কী করতে পারি। কে আপনাকে আসতে বলেছে! আমি যন্তর-মেশিন নই। অর্ডারটা হয় কি না খোঁজ নেবেন পরের সপ্তাহে। আমার এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

ব্যর্থ হতোদ্যম হয়ে ফিরে আসতে হয় তার পরের পরের সপ্তাহেও। নালিশ জানাতে গেলে কর্তা সে নালিশ নেন না। রাম শুনে রুষ্ট হন। যেতেই বলে দেন, সাহেবকেই বলুন গিয়ে। যা করার উনিই করবেন।'

যায় না ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস-খাওয়া; বিনা খেসারতে, অল্প আয়েসে কিছু পাওয়া।

বেতনের টাকাটা পকেটস্থ হবার পর দুটো-চারটে দিন কর্মে উৎসাহ পেয়ে থাকেন রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুরা, নতুবা আসেন-যান, খান-দান, গল্পগুজব করেই কাটান।

আর একবার চায়ের পেয়ালায় তুফান। চায়ে চুমুক দিতে দিতে এর-ওর টেবিলে ঘুরঘুর, আলাপ-সালাপ। এসে যায় টিফিন খাবার বেলা। খিদে-তেষ্টা পায়। কেউ কেউ খান ঘরের টিফিন। রুটি-পরোটা, আলুরদম, ডিমসেদ্ধ। গিন্নির মুখখানি ভেসে ওঠে টিফিন খেতে খেতে। অফিসে বেদম খাটাখাটুনি করে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কর্তা ঘরে ফিরলে আর একদফা করবে সে জলযোগের ব্যবস্থা।

যাঁদের পরিবারে একাধিক আয় উপার্জনকারী, তাঁদের দু-একজনও

কাজ করছেন এই অফিসে। কাজকর্ম তো নামে, খেয়ে-দেয়ে বেড়িয়ে শখ পুলকই মেটানো।

অফিসপাড়ার পথে পথে রয়েছে সারি সারি খাদ্যবিপণী। মিলছে সেখানে সবরকম খাবার-দাবার। তেলেভাজা, মুড়ি-মশলা, ফলটল বসে অফিসের গেটে। কিনে-কেটে খাচ্ছেন যাঁর যেমন অভিরুচি।

টিফিন যা হোক হল। একবার যখন তলায় নামা হয়েছে, উপরে ওঠা যাবে না সহসা। ওই পথে বেরোন হবে টুকটাক সওদা করতে, সিনেমার টিকিট কাটতে। সওদা বলতে হালফ্যাসানের জামাপ্যান্টের পিস। স্নো-ক্রিম-টুথপেস্ট-ব্রাশ, তৈল মর্দনের জন্য বিশুদ্ধ সরষের তেল, সহধর্মিণীর সাজগোজের ফরমায়েশী মালপত্র। শরীর-গতর সুস্থ-সবল রাখতে কৌটোয় ভরা প্রোটিন-হরলিকস-কমপ্লান। কো-অপারেটিভ স্টোরে সমবায়িকাতে ন্যায্য দামে এসব মিলছে। খাইয়ে-দাইয়ে বিশ্রাম দিয়েই তো অঙ্গের সৌষ্ঠব লাবণি বাড়িয়ে তোলা।

যেন তেন-প্রকারেণ ধরে-পড়ে 'মাল-কড়ি' ছেড়ে সরকারি খাতায় নামটা উঠাতে পারলে কিস্তিমাত। মাস কাবারে মাইনে বাঁধা। চুরি-ডাকাতি না করলে এ স্বর্গসুখের সমাপ্তি ঘটবে না আঠান্ন-ষাট বছর বয়সের আগে। দাঁত পড়বে, চুল পাকবে, গাল চোপড়া ভাঙবে। সে-সত্ত্বেও আঠান্ন বছরটাকে বাষট্টি বছরে গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে—বয়স ভাঁড়িয়ে—ফেরেববাজি করে কাগজপত্র লেপে-পুছে। যারা গ্রুপ ডি কর্মী তাদের তো সোনায় সোহাগা! খাতাপত্রে এমনই আনছান হিসাব রাখা থাকে, যাতে করে সত্তর বছর অবধি চাকরিতে টিকে থাকা অসম্ভব নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ ঠিকুজি কোষ্ঠিই

যথেষ্ট। যৌবন থেকে প্রৌঢ়, এই সুদীর্ঘ কালটা ফাঁকি-ঝুঁকিতে ঠকে-ঠকিয়ে কাটে। নিয়মিত কে ডিউটি করছে না-করছে সেটা দেখবার জন্যে কেউ বসে থাকে না।

আয়-উপার্জন, উদরপূর্তি, বিলাস-ব্যসনের যা হোক সুরাহা হল। এবার একটু ফুর্তি-টুর্তি না করলে চলবে কেন? দেখতে হবে সঙ্গিনী-বান্ধবী জুটিয়ে নেওয়া যায় যদি! অচিরেই মেলে সে-জনের দেখা। রতনে রতন চিনে নেয়। একসঙ্গে পথ চলতে চলতে মত বিনিময় ও বোঝাপড়া হয়। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে খিল ধরে, চাপেন রিকশায়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেন। ব্যস, ওতেই হবে। সতর্কতার সঙ্গে ধাপে ধাপে সিঁড়ি টপকান। যান হোটেলে রেস্টুরেন্টে। প্রাণে যা চায় ভাগে-যোগে খান। লজ্জা কিসের! এ যে হয়ে আসছে, চলে আসছে নিরবধিকাল। দেখেশুনেই শিক্ষালাভ। ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয় হয়, ইস্পাত লোহা গলে, তবে কেন মানুষের মন-গলানো যাবে না?

যাঁরা বিবাহিত, শান্ত নম্র লাজুক প্রকৃতির, গড়িমশি করতে করতে তারাও 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' বলে এগোন। অভিনয় চাতুর্য দেখিয়ে নিজেই নিজের গুণকীর্তন করে সম্ভব হয় একজনের মন পাওয়া।— ঘরে পতিব্রতা সতী যেন তোলা উনুন, এদিকে একজন মেলে-মেশে, ভাল লেগে যায় পরস্পরে। নর আঁকড়ে ধরে নারীকে। আকর্ষণটা গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নিয়মে।

অফিস এক আড্ডাখানা। অন্তত এ-অফিসের ক্ষেত্রে কথাটা সত্য। চোখ-কান মুদে যা ইচ্ছা কর। নাচো-গাও, নিয়মশৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতার বালাই নেই। তাই তো অফিসের ফাইল-র‍্যাক-আলমারির আড়ালে পুরনো ফাইলের রেকর্ডরুমে তাসপাসা খেলা, সাট্টা-রেসের বাজি ধরাও হয় সম্ভব। এসব তো চলে লুকিয়ে-চুরিয়ে। প্রকাশ্যেই দেখা যায় কত কি করতে। 'তাইরে নাইরে না'—নেচে নেচে গান গাওয়া হয়। পলাশ নামের ছেলেটি রেডিয়োতে গান গায়।

সেই গাওয়া গানই সে গেয়ে শোনায়। অফিসে এসেও করে সঙ্গীত সাধনা। জম জমাট বসে যায় গানের আসর। টেবিলে টেবিলে উত্তম-মধ্যম বোলতান পড়ে। স্বর লহরী ওঠে-নামে। বিস্তৃত পরিব্যাপ্ত হয় সুরের ইন্দ্রধনু অফিসের এক রুম থেকে অন্য রুমে। পলাশ সব শেষে গায়—

তুমি রূপ দেখে ভালবেসো না
রূপের মোহ বড় বিষময়
ভালবেসে সুখ পাবে না,
রূপ দেখে ভালবেসো না।

মনে হয় রূপ যেন সে আঁধারের আলো
যেন ধূপ-ধুনো দিয়ে সন্ধ্যাবাতি জ্বালো।
নিভে যায় সে যে দমকা হওয়ায়
মনের বাসনা সফল হয় না।

যৌবন জোয়ারে মদন তুফানে
ভেসে যায় দেহ ভীম আলোড়নে।
জলবিন্দু প্রায় রূপ চলে যায়
প্রাণে দিয়ে বিষম যাতনা।

ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। অনেকেই জড় হয় পলাশের গান শুনতে। দিব্যি গান গেয়ে, গান শুনে, হেসে খেলে, নভেল পড়ে, গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ানোই নিত্য-কর্ম-পদ্ধতির আওতাভুক্ত। কাজকর্মে আগ্রহ নিষ্ঠা নেই। উর্ধ্বতনের তাগিদও নেই, মুরোদও নেই কারও শাসন বিধি-আরোপ করবার। দুর্নীতিকে সুনীতি, অব্যবস্থাকে সু-ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

চার ঘণ্টা লাগিয়ে দেন কুড়ি লাইনের চিঠিটা টাইপ করতে কোনও এক টাইপিস্টবাবু। অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে পাঁচ ছটা শব্দ সাজান

আর পাশের লোকের সঙ্গে করেন রং-তামাসা। পার্শ্ববর্তী 'বাবু' বা 'বিবি' অফিসিয়াল চিঠিপত্র লিখবেন বলে বিস্তর ফাইলপত্র হাতড়ে ইংরাজি বাক্য গঠনে মনোযোগী হন। যাকে বলে 'যদ্ দেখিতং তদ্ লিখিতং'—মুসাবিধা করতে গলদঘর্ম, তাতে থাকে কাটাকুটি, ভুলচুক। কাজটুকু মিটতে দিনটাই যায় লেগে, ব্যস্ত হন না। বছরটাকে আঠারো মাসে গড়িয়ে নিতে চান। সবই তো প্রায় গতিছন্দহারা। যেমনটি চলছে চলুক না।

কায়ক্লেশে কাজ করার অভ্যাস বজায় রাখা। দায়িত্ব চাপলে চোখে ধুতরো ফুল দেখতে না হয় তাই। এখানে হচ্ছে-হবে বলে কালহরণ করলে, ফাঁকি দিলে জবাবদিহী হতে কিংবা শাস্তি পেতে দেখা যায় না। সরষেতেই তো ভূত। যিনি অফিসকর্তা, তারও কম নেই ত্রুটি গাফিলতি। যার হাতে সমাধান তিনিই তো নিষ্ক্রিয়। অনিয়ম-বেনিয়ম যা চলছে তা চলত না তিনি সাচ্চা হলে। কথাটা বেমালুম বুঝতে পেরেছেন স্বয়ং রাজ্যের কর্ণধারও, প্রশ্ন তুলেছেন হতাশাগ্রস্ত হয়ে—'কাদের কাজ করতে বলব? খালি চেয়ারকে, না মানুষকে।'

প্রশ্নটা অনেককে ভাবাচ্ছে, সরকারি চাকুরেদের গালমন্দ দিয়ে একথাও বলছে কেউ কেউ—'ওরা মুখেনঃ মারিতং জগত, কার্য-কর্মে অষ্টরম্ভা।'

কারও কারও মতে এসব বাড়িয়ে-বানিয়ে বলা। বিপরীত চিত্রও আছে; কয়েকজনের দোষে দোষী করা যায় না সকলকে। এক দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের রীতি চাল চরিত্রেও রয়েছে অসাদৃশ্য পার্থক্য। দপ্তরে দপ্তরে রয়েছেন করিত-কর্মারাও, তাঁরাই করছেন সরকারের মুখরক্ষা। সুখ্যাতিও তাই করতে হয়—'কে বলেছে সরকারি কর্মীরা কর্মবিমুখ? সবকিছু তা হলে চলছে কী ভাবে?"

সরকারের মুখরক্ষাকারি 'সবকিছু' চালানোর অংশভাগী জানি না ক-জন আছেন-না-আছেন! এটাও জিজ্ঞাস্য। একফালি সূর্য

গুটিকয়েক নক্ষত্র কতটুকু পারে গাঢ় অন্ধকারে আলো এনে দিতে?

*

*　　*

ফের একদিন অফিসে চলছিল কূটকচাল তর্কবিতর্ক। এমন সময় ব্যস্তসমস্ত জনকয়েককে দেখা গেল। ওঁরা ভিন্ন পথের দিশারী, পৃথক ওঁদের কর্মধারা। বুক টানটান করে এক ব্যক্তি এলেন এগিয়ে দলপতির ভঙ্গিমায়। বক্তব্য রাখতে থাকলেন—'বন্ধুগণ, একটু শুনবেন, আপনারা জানেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আজ কি গুরুতর সঙ্কটাপন্ন। বৈদেশিক ঋণের চাপে ভারতবর্ষের উঠেছে নাভিশ্বাস। তারই ভেতর এসে পড়েছে একটা নির্বাচন স্বার্থান্বেষীদের হীন ষড়যন্ত্রে। নির্বাচন ডেকে সাধারণ মানুষের ওপর বেশ কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়-বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকাটা যে জলবৎ খরচ হবে, সেটা যাবে আপনার-আমার পকেট থেকে। ভোটের পর জিনিসের দাম কমবে না, বাড়বে। চাল-ডাল-তেল-লবণ প্রভৃতি চোদ্দটি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী আমরা গোটা ভারতে সরবরাহের প্রস্তাব রেখেছিলাম, কেন্দ্র সেটা বাতিল করে দিয়েছিল। ক্ষমতায় ঘুরে এসে এসব আমরা দেখব, বেকারি-ও নিরসন করব। বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলব আমরা হলদিয়া-বক্রেশ্বরকে। লক্ষ লক্ষ বেকারের রোজগারের পথ হবে সেখানে। আমাদের ছেলেরাও পাবে চাকরি। বন্ধুগণ, বেশি কথা বলতে চাই না, সামনে আসছে যে কঠিন পরীক্ষাটা, তাতে আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে। স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করবার ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে গড়ে তুলবার জন্য যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছি, তা যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারি তার দরুন সকলে প্রয়াসী হবেন। ওই দিন সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন। আমাদের

প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবেন, এই অনুরোধ ও আশা রেখে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।'

'বিশে মে আসছে দিন, স্বৈরতন্ত্রকে কবর দিন—কবর দিন'—স্লোগান দিতে দিতে সদলে প্রস্থান করেন। ও-বাড়িতে আরও যে-সব অফিস রয়েছে যাবেন সেখানেও। কর্মচারী বন্ধুদের ভিতর বিবেক-বুদ্ধি এনে 'বৈপ্লবিক চেতনা' জাগিয়ে তোলা হবেই। তা না হয় হল, বলবার কথা আরও ছিল।

যে যে-কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, সে-কাজ সে করতে বাধ্য—দায়বদ্ধ। কাজের বিনিময়ে বেতন। অথচ কে কতটুকু করছে কাজ! এ পরিস্থিতিতে এ স্লোগানটাও যেত না কি দেওয়া—'কাজ বুঝিয়ে দিন, বুঝিয়ে নিন। কাজ না করলে শাস্তি হোক শাস্তি হোক।'

এতে কেউ আতঙ্কিত ক্ষুব্ধ হলে হোক। যেমন কর্ম তেমনই তো ফল। ওরা বেরিয়ে গেলেও হট্টগোল থামল না। বক্তাটির ভাষণ কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

কে যেন বলল 'আমাদের গলার আওয়াজ চড়লেই সাহেব-সুবোরা বিরক্ত হন। সাবধান করতে লোক পাঠান। আর ইউনিয়ন সংগঠনের মাতব্বরেরা বন্ধুগণদের ডেকে ডেকে অফিসটাকে 'মনুমেন্টের পাদদেশ' বানালেও নীরবে মেনে নেব।'

দপ্তরী হীরেনও উঠল খ্যাকখ্যাক করে—'কর্মচারী দরদী সেজে ওঁরা শুধু গালভরা বুলি কপচান। কাজের বেলায় লবডঙ্কা।'

'ওহে হীরেন, কথাটা তো ওঁদেরই বলে দিতে পারতে!'—কথাটা কে যেন বলতেই হীরেন চড়িয়ে দিল গলাটা—'আমি কি বলতে বাদ রেখেছি! ওঁরা যখন যেটা চেয়েছেন, একদিনের থোক বেতন, তহবিলে তহবিলে অর্থদান—সংগ্রাম, ভবন নির্মাণ, খরাত্রাণ, বন্যাত্রাণ—এর সব খাতেই পয়সা দিয়েছি। ও-সবে নেই আর আমি, মাসিক চাঁদাটাও বন্ধ করে দেব। অফিসের পেছনে জীবনটা কাবার করে অন্যায় অবিচারই পেয়ে এলাম। যেমন অফিস তেমনই ইউনিয়ন!

অধমের দিকে কেউ ফিরে তাকাল না। আপনারা তো জানেন আমার সমস্যাটা। চাকরিতে অধীর রায় আমার পনেরো মাসের জুনিয়ার। একই পোস্টে সমান যোগ্যতা নিয়ে কাজ করছি ওর পাশে বসে। অথচ আমার চেয়ে ও বেতন পাচ্ছে আরও বাড়তি শ দেড়েক টাকা। সমবেতন দেওয়া হবে সমকাজে তাও তো দেওয়া হল না!'

অধীর আগে যে অফিসে ছিল, সেই অফিসও ওকে পরবর্তী বেতন স্কেলটি দিয়েছে। দিয়েছে যত কিছু সুবিধে-সুযোগ--হীরেন যা পায় নি। বেতনের ক্ষেত্রে জুনিয়র তার সিনিয়ারকে টপকাতে যে পারে না। সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী থাকলেও তা কার্যকরী করা হয় নি এই অফিসে। কর্তৃপক্ষীয়দের বক্তব্য হচ্ছে—হেডঅফিসকে অনেক বুঝে-শুনে চলতে হয়। নিতান্ত ভুলবশতঃ গোনাগুনতি দু-পাঁচ-জনকে সামান্য সুবিধাদি দেওয়া হয়। ভুল হয়েছে জানার পর সে-ভুল আর করা যায় না। বর্তমানে কিছু কিছু সার্কুলারের কার্যকারিতাও নেই। খুঁচিয়ে ঘা করে অধীরকে অতিরিক্ত দেওয়া টাকাটা কেটে নেওয়া হোক, এটাই কি তুমি চাও হীরেন?'

কারও ক্ষতি সাধনে আগ্রহী নয় হীরেন। চুপ করলেও সে মনে মনে গজরায়। কে দায়ী অফিসের এই ভুলভ্রান্তির জন্যে?

গুটিকয়েক হীরেন পড়ে পড়ে মার খেল। রয়ে গেল তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। অধীর রায়ের মতো যারা আর্থিক দাক্ষিণ্য পেয়েছে, তা সে যতই নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে পেয়ে থাকুক না কেন—ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লেও বেবাক মুকুব হয়ে গেছে। একজনের সঙ্গে অন্যজনের বেতনগত বৈষম্য ঘোচে নি। এর বিহিত করা সম্ভব মামলা-মকদ্দমার পথে গিয়ে। কিন্তু-কিন্তু করতে হয়, বিবেকে বাধে নিজের অফিসের সঙ্গে মামলায় জড়াতে। কর্মচারীদের অভাব অভিযোগের ব্যাপারে অভিযুক্ত করে সরকারকে আসামীর কাঠগড়ায় চড়াবার মতো ঘটনা যতটা এড়ানো যায় ততই মঙ্গল।

ইউনিয়নের লোক চলে গেল। হীরেনও চুপ করল, তবু অফিস

নিশ্চুপ হল না। মেয়ে-মহিলাদের তখন কথায় পেয়ে বসল। সরব হয়ে উঠলেন তাঁরা। সিনেমা ম্যাগাজিনের বিনোদন সংখ্যা উলটে-পালটে দেখা। চলচিত্র জগৎ সম্পর্কে মন্তব্য ও সমালোচনা। কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রী জুটির সম্পর্কছেদ এবং তাঁদের তৃতীয় ও পঞ্চম-বার করে সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচন, এখানেই ক্ষান্ত হল না। অফিসের মেয়েরা জুটল এসে একখানে। সিনেমা থেকে ঘরোয়া কথার দিকে বাঁক নিল আলোচনাটা। শাড়ি-গয়না-ফ্যাশান কী না থাকে আলোচ্য বিষয়সূচীতে। হল সরস হাসি-মস্করা নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়েও। সবশেষে রান্না-বান্নার কথায় যাওয়া হল। কীভাবে কী রান্না করলে একভাগেই থালা খানেক ভাত সাবাড় করা যায়। পুঁই চিংড়ি, সরষে বাটা সজনে ডাঁটা। গাছপাঁঠার মাংস বা এঁচড়। কোন্‌টা কতরকমভাবে নেড়ে-চেড়ে রসনা তৃপ্তিদায়ক করে তোলা যায়, না যায়।

মেয়েরা অফিসমুখী না-হলে, বাইরে না বেরোলে এমন ঘরোয়া শয়ন-স্বপনের কথা, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বৈঠক জটলা বোধকরি জমতই না।

নারী স্বাবলম্বী হতে চাইছে, অফিস আদালতে যুক্ত হচ্ছে। কারও কারও দুর্বলতা কাজ জানা নেই। সময় সময় কাজ করে দেখাতে হবে। কাজ শিখতে হলে কারও উপর নির্ভর করতে হয়। চালাক চতুর ছেলেরা সহযোগিতার হাত বাড়ায়। বুঝিয়ে পড়িয়ে সড়গড় করে যদি তোলা যায়।

যে-মেয়ে দেখতে শ্রীময়ী জুতসই তাকে নিয়ে পড়ে টানা-হ্যাঁচড়া। কে এগোবে আগে-ভাগে, কে নেবে কাকে, পড়বে হুড়োহুড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। একে অপরকে ল্যাং মারবে। ট্রেন-বাসে জায়গা পাবার জন্য যেমন চলে দৌড় লম্ফ-ঝম্প, জোর হিম্মত-তাগত দেখাতে হবে। যে জন ক্ষীণ দুর্বল কুরূপ-কুৎসিত স্বল্প-উপার্জনকারী, জয়ী সে হতে পারবে না এ খেলায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের চাকরিতে পাঠানো মানে তাদের পাত্রস্থ হবার রাস্তা সুগম করে দেওয়া। ঘর-বর জোটে কারও বাসে-ট্রেনে চলতে ফিরতে, চেনা-জানা হতে হতে। আবার অফিসেও, বিয়েতে যৌতুক, দান-সামগ্রী জোগাড় করতে অক্ষম বাবা-মা ভাবেন বাইরে বেরোবার সুযোগে মেয়ে যদি পছন্দ করে কারও গলায় মালা দেয় তো দিক না। দেখা যায় খুব একটা বিলম্বও হয় না দেওয়া-নেওয়ার পালা শুরু করতে। কখন কার নজরে কোন্ গুণটা প্রকট হবে কেউ-ই পারে না বলতে। বলা যায় না কে কখন কার দিকে ঝুঁকবে। সিংহ-ভাগ পুরুষই মেয়েদের রূপ মাধুরীর সঙ্গে চটকদার সাজ-সজ্জা, ঠাট-বাট, কায়দা-কেতার সমজদার।

আলাপ জমাবার কালে বেশ দাদা-দিদি ভাই-বোন, রক্তের জন। নয়ন-মন-ভুলানো বোনটি যদি কাজ-কর্মে চৌখস না হয় তবে তো অতীব সুযোগ। পাশে বসে কথায় কথায় জানতে হবে ভগ্নীর মনের দিকদিশা, মনে-প্রাণে মিল খেলে বোন হবে বান্ধবী। কতদিন লাগবে সে-প্রেম দানা বাঁধতে সেটা যার যার সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করে। টিফিন খাওয়াতে হবে, সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে। দিতে হবে উপহার-উপঢৌকন, উদার দিলদারের মতো। পোষ মানলে ছোঁও ধর, গল্পসল্প কর, পৌরুষ জাহির কর। বর প্রদান করবেন ঋষি প্রজাপতি।

সংসার পাতে কেউ পাকাপোক্তভাবে, কেউ আবার চায় না অতটা এগোতে। থাকে তাদের 'বিবাহাতঙ্ক' দুরারোগ্য 'জলাতঙ্ক' রোগের মতোই। থাকে সন্দেহ ভীতি দুর্বলতাও, বিয়ে-থা করে পরের মেয়ের তালে তাল দিয়ে পারবে তো চলতে।

শুভমিলনে যদি কোনরকম সমস্যা-ধন্দ থাকে তা নিরসনে সহযোগিতা করবেন ইউ ডি ক্লার্ক শ্রীমতীদি, শ্রীমতী গুপ্ত। দুয়ে দুয়ে এক করে দেবার বেলায় উৎসাহ কম নেই তাঁর। এ যাবৎ বেশ কয়েকজনই জীবনসাথী বেছে নিয়েছে তাঁরই মধ্যস্থতায়।

এ-অফিসে শ্রীমতীই ছিলেন একমাত্র মহিলাকর্মী। স্বামী কাজ করেন মহাকরণে। টালিগঞ্জের ওদিকে বাড়ি। দেবর-ননদও চাকুরে। সময় কাটে না বলে চাকুরিতে আসা। পুরুষালী কণ্ঠস্বর, গোলগাল মুখাকৃতি, কথার পৃষ্ঠে কথা ছোঁড়েন। কোনদিন কারও টেরা-বাঁকা কথার ধার ধারেন না। চাকরিতে এসে জনকয়েক অফিসারের হাল চাল তাঁর জানা হয়ে গেছে, তাঁদের অমানবিক স্বভাব চরিত্রের কথা গল্পচ্ছলে বলেনও।—মিশুক, অমায়িক যে মিত্রসাহেব, তিনি তো প্রভাব খাটিয়ে চাকরি করতে আসা কোনও কোনও মেয়েকে নিতেন কাছে টেনে। উঠতি মেয়ে বিশাখাকে কবজা করে নিয়ে ছুটে বেড়ালেন কোথায় না কোথায়! বাড়ির লোক জানল গিয়েছে মেয়ে বান্ধবীর বাড়িতে। এদিকে সাহেব তো মজা লুঠতেন তাকে নিয়ে। ওকে নিয়ে হোটেলে উঠতেন দিনমানেও। মেয়েটারও দোষ ছিল, অনেক কষ্টে চুম্বককে সরিয়ে আনা হয়েছিল লোহার কাছ থেকে। অন্য একজনের সঙ্গে সেই বিশাখা সংসারও পেতেছিল, সুখেই আছে।

বিশ্বাস সাহেবের নামেও কেচ্ছাকীর্তি কম নেই। স্টেনো লীলা দত্তকে নিয়ে উদোম মদমত্ত অবস্থায় গড়ের মাঠে পড়ে থাকা। গাড়ি আটক, পুলিশী হুজ্জোতি কি না হল! লীলাদেবীও দিনের পর দিন লীলাখেলা দেখিয়ে একজনের গৃহবধূ হলেন। গর্ভ-টর্ভ হলে যা একটু হ্যাপা, নতুবা ওসবে এসে যায় না। সবাই সমান নয়, পুরুষের প্রভাব প্রাধান্য যতই থাকুক, কোনও কোনও মেয়ে থাকে অনড়।

ছোট থেকে বড় মন বোঝা দায়। ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকেন যে সিনহা সাহেব, যিনি এখন দপ্তরের বড় কর্তা। দেখলে মনে হয় উদাসী অনাসক্ত, দুনিয়ায় সবেতেই বিরূপ, অথচ মেয়েছেলে পাকড়াও করবার বেলায় উনি সেদিনও ছিলেন ওস্তাদজি। বিকৃত বদ রুচি-তৃষ্ণা অনেকেরই যখন থাকতে পারে তাঁরই বা থাকবে না কেন! ভদ্রবেশী ধূর্ত, চরিত্রহীন মানুষ যাকে বলে, তিনি ছিলেন তাই। ডেকে আনতেন রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কলগার্লদের। যেতেন অন্যস্থানে-

কুস্থানে। যাদবপুর অঞ্চল থেকে অফিসের গাড়ি পাঠিয়ে আনাতেন এক রূপসীকে। একদিন বেঁকে বসল ড্রাইভার জনার্দন, বলে—আমি আপনার ব্যক্তিগত চাকর নই যে যা বলবেন অমনি শুনব। আর আমাকে পাবেন না এ নোংরামির মধ্যে, ছুটির পর সরকারি গাড়ি উঠিয়ে দেব সরকারি গ্যারেজে।

জনার্দন পড়ে সিনহাসাহেবের কোপানলে, বাঁচিয়ে দেয় তাকে কর্মী সংগঠন। সরকারি গাড়ি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে-কথাও চাউর হয়ে পড়ে। টনক নড়ে রাঘববোয়ালদের। সতর্ক থাকেন দিন কতক। পরে যথাপূর্বম তথা পরম। দুর্নীতি-অনিয়ম তো যেদিকে চোখ ফেলতেন সেদিকেই। কথাটা নিয়ে কে মাথাব্যথা করবে? চাপের মুখে আজ যিনি নত হচ্ছেন, নোংরা হাত আড়ালে লুকোচ্ছেন—কাল তিনি যে স্ব-মূর্তি ধরবেন না, কে তা বলতে পারে?

শ্রীমতীর উপদেশ—যেটুকু যা করবে তা যেন সম্পূর্ণ হয়। ফাঁকিও দেবে না, কাজ পাগলও হবে না। প্রশংসা পাবার জন্য কাজ দেখাতে গেলে গাড্ডায় পড়বে। মাত্রা ছাড়া খাবে না, জানবে কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।

শুভেন্দু চৌধুরী-বর্ণালী গোস্বামী-ভবনাথ সরকার ও দিব্যেন্দু মল্লিক, শ্রীমতী গুপ্তর ধারে কাছে বসে। দিব্যেন্দু ছাড়া মোটামুটি আর সবাই কাজের লোক। চেয়ার ছেড়ে নড়ে না। মাথা গুঁজেই কাজ করে। দিব্যেন্দু অ-কাজের ধাড়ি। বর্ণালীর দিকে পা বাড়ায় সে কয়েকজনকে ডিঙিয়ে। কাজ শেখাবার অছিলায় নয়, খেজুরে আলাপ জুড়তে, ওকে খারাপ করতেও।

দিব্যেন্দুর সান্নিধ্য থেকে শুভেন্দু ছিনিয়ে আনে বর্ণালীকে। শুভেন্দু ওর কাছে শত্রু বনে। চোখের বিষ হয় বর্ণালীও, আড়ালে-আবডালে শাসাতে থাকে, প্রতিশোধ নেবেই একদিন-না-একদিন।

দিব্যেন্দু বেপরোয়া-উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল। থাকে বেহালা। বেহাল বেহেড অবস্থায় কাটায়। ওর বাবা-মা এক ভাই থাকে নাগের-বাজারের বাগানবাড়িতে, চাষবাস আছে, আছে তেলকল, ধানকল, বেহালার বাড়িটাও নিজস্ব, ভাড়াটে বসিয়েছে একতলার চারখানা ঘরে। মাসান্তে থোক হাজার দুই টাকা হাতে পাবার কথা, সে-টাকাটা এক বছরের ভাড়া হিসাবে অগ্রিম নিয়ে নিয়েছে। যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে তাই দিয়ে। হোটেল রেস্তোরাঁয় আহারাদি সারে, মদ খেয়ে চুর হয়। বাবার কেনা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পুরনো মডেলের একটা গাড়ি চড়ে শহর টহল দেয়। কোনদিন অফিসে আসে, কোনদিন আসেও না, ওর স্বভাব-চরিত্র ভাল থাকলে তো কথাই ছিল না। ঘর তো করবে না, দুদিনের খেলা খেলবে। নিবৃত্ত করবে বিকৃত যৌন-তাড়না, ওর তো সেই তালাস।

অনেকে অনেক কিছু ভাবল শুভেন্দুকে, নস্যাৎ-ও হয়ে গেল তাদের যত ভাবাভাবি। বর্ণালীর যে আজ বিয়ে!

বাজছিল বাদ্যি-বাজনা, বুকখানা যাচ্ছিল ফেটে। মিলনের মাঝে শুনছিল বিষাদের সুর। বিয়েটা হচ্ছে যার অকৃপণ দান-সহযোগিতায় সে যে শুভেন্দু। গতকাল আসবে কথা দিয়েছিল, তবে কেন এল না!

উলু-শঙ্খধ্বনি, ঢাক-সানাইয়ের আওয়াজ। মেয়ে-বউরা বজায় রেখেছে ওপার বাংলার উৎসব ধারাটা। চলেছে তারা জল ভরতে বিচিত্রসুরে গান গাইতে গাইতে—হাতে বরণডালা, কাঁখে কলসী, ওরা গাইছিল—

তোরা কে যাবি যমুনার জলে
আয় সকলে

শূন্য কুম্ভ বক্ষে লয়ে জল ভরিতে চল
তোরা কে যাবি যমুনার জলে
আয় সকলে।
অর্ধকুলা হস্তেলয়ে জল ভরিতে চল
আগর পাখা হস্তে লয়ে জল ভরিতে চল
তোরা কে যাবিগো যমুনার জলে
আয় সকালে ॥

বর্ণালী যার কথা ভাবছিল সে এল। আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা শুভেন্দু কম নয়, ওকে এখন হাতমুখ ধোবার জল দেওয়া দরকার। খেতে-টেতেও না দিলে হয় না। বেমক্কা আগের মতো সে পারছে না কাছে ছুটে যেতে, সে-যে বিয়ের কনে। ঘণ্টাকয়েক উত্তীর্ণ হলেই হবে এমন একজনের অর্ধাঙ্গিনী, যে অজানা-অচেনা। এ বিয়ে প্রেম-ভালবাসা করে যেচে-দেখে তো নয়।

শুভেন্দুর হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে নিয়েছিল বর্ণালীর ভাই বিলু। ওর কাছে ডেটল চাইতেই, 'দিদি, এই দিদি' বলতে বলতে চলে গিয়েছিল ঘরে।

চাকদা থেকে হাবড়া কম দূরত্ব নয়। কম ধকল পোহাতে হয় নি আসতে। উদ্বাস্তুঘেঁষা এই অজ গাঁ আনন্দপুরে আসতে বারতিনেক যানবাহন পালটাতে হয়েছে।

কলতলা থেকে এসে শুভেন্দু দেখল সামনেই স্বয়ং বিয়ের কনে। ডেটলের পরিবর্তে সে ক্রিম নিয়ে এসেছে; বলল—'কা গো আসতে না আসতে ডেটলের খোঁজ কেন!'

—'দেখনা, হাঁটুটা ছড়ে গেল বাস থেকে নামবার সময়। গেছে অল্পের উপর দিয়ে। কাল আসা হল না বাপনটার জন্যে, ও ভীষণ বায়না করছিল রাত থেকে, ফার্স্ট ট্রেনটা ধরেই পালিয়ে চলে আসতে হল। শুক্লাদিকে বলে এসেছি ওকে একটা দিন সামলে-সমঝে রাখতে।'

—'বাপনকে নিয়ে এলেও পারতে। কত যে ত্যাগ করে চলেছ তুমি আমার সুখের কথা ভেবে। সুখ আমার সইবে তো! ক্ষণিকের তরে যাকে দেখা, তাকেই মালা পরাতে হবে, এই কি আমি চেয়েছিলাম!'

বর্ণালীর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তার অন্তরের অভিব্যক্তি। চোখের কোলে চিক্‌চিক্ করে জল। সে তার জীবন-যৌবন-প্রাণ-মন কাকে সমর্পণ করে সুখী হবে, কেউ-ই তা বুঝতে চায় নি। এমন কি শুভেন্দুও নয়।

শুভেন্দু বলে—'যা হয় নি হবার নয়। তা-ই নিয়ে এখনও তোমার আক্ষেপ। যে যা চায় সে কি তা পায়!'

ওর হাঁটুতে ক্রিম লাগিয়ে দিতে দিতে বর্ণালী বলল—'আমার বউভাতে যেতে বাধা কর না। তুমি না গেলে সব আনন্দই মাটি হবে।'

কলসীতে যারা জল ভরতে গিয়েছিল তারা ফিরছে। একই দৃশ্য, উলুধ্বনি, শাঁখে ফু, ঢাক-সানাইয়ের প্যাঁপো, তাক ডুমাডুম। বাঙলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত কথা ও সুরধ্বনি। এ গান যারা জানে ডাকলেই তারা আসে আগ্রহ সহকারে। হাতে হাতে পান-সুপারি দিলেই হয়। ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে গায়িকার সংখ্যা, উঠোনে জড় হয়ে তারা গাইতে থাকে একটার পর আর একটা গান।

বাতাসে ভাসছিল বকুল ফুলের গন্ধ। নানা ছাঁদে খোঁপা বেঁধেছিল মেয়েরা, খোঁপায় গুঁজেছিল ফুল তা থেকে ছড়াচ্ছিল সুগন্ধ-সুবাস। অনেকে মাতোয়ারা তখন উৎসব-উল্লাসে। তারই ভিতর শুভেন্দু-বর্ণালীর বিমর্ষদশা নজর এড়াবার নয়। শুভেন্দুর চোট দেহে, বর্ণালীর মনে। একটা দৃশ্যমান, অন্যটা গভীর গোপন মর্মস্থলে চাপা আগুন হয়ে ধিকি-ধিকি জ্বলছিল। কজনে তা জানছিল বুঝছিল? কেবা কার মনের খোঁজ রাখছিল? বেজায় কঠিন রহস্যময় মনের নাগাল পাওয়া।

থেকে থেকেই কেউ না কেউ বর্ণালীকে ডাকছিল খুঁজছিল।

শুভেন্দু সরে এসেছিল ওর সামনে থেকে। আর তো প্রয়োজন হবে না ওকে নজরদারি পাহারাদারির। কতদিন ওকে সে আগলে আগলে রেখেছে। থাবা বসাতে দেয় নি কাউকে। সন্ধানও এনে দিয়েছে পাত্রটির। মলয়ের বাড়ি আছে, চাকরি করে মিল্ক ডেয়ারিতে। বিয়ে বলে কথা! শুভেন্দুই জোগাচ্ছে বর্ণালীর বিয়ের অর্ধেক খরচপাতি। কমপক্ষে বিয়েতে যা-যা লাগে দুজনে কিনে এনেছিল গত সপ্তাহে।

বর্ণালীর বাবা চাকরি করতে করতে মারা যাবার ফলেই কাজটা পেয়ে যায় বর্ণালী। ঘরবাড়ি বানাবার সময় ধার-কর্জ করতে হয়েছিল। মাসে মাসে সেই টাকাটা শুধতে হচ্ছে বলেই টানাটানি।

শুভেন্দু কাকভোরে বেরিয়েছে চাকদা থেকে। মুখে জলটুকু দেয় নি, পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। চুপচাপ বসল এসে গাছতলার ছায়ায়—যেখানে বকুল গাছটা মাথা উঁচিয়েছিল। থেকে থেকে রোদ এসে পড়ছিল গাছের ফাঁক দিয়ে। শুভেন্দু নাড়াচাড়া করছিল একবার পিছনের দিনগুলো। উত্থানের পর আসে পতন। পতন থেকে উত্থান হওয়া দুরূহ। শুভেন্দু যেটুকু যা এগিয়েছে সে তো মনের জোরেই! বাবা মৃত্যুঞ্জয়কে কম হিমশিম খেতে হয় নি সংসার যুদ্ধে নেমে! তাঁর দুঃখময় স্বল্পায়ু জীবনটার কথা ভেবে মনটা হয়ে ওঠে ব্যথাতুর। একই দিনে বাড়ির তিন তিনটি লোক চলে যান বাবাকে ফাঁকি দিয়ে। কলেরা হয়েছিল ঠাকুরদা-ঠাকুরমা-পিসিমার। সেই মহামারী মহারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন নিজেও। পায়ে পুছে তাঁকে রক্ষা করলেন রক্ষাকর্তা। ঘাড়ে চাপল দুই দুটো দুগ্ধপোষ্য বোন।

তাদের প্রতিপালনের ঝক্কি কায়ক্লেশে পালনও করলেন। একটা ধাক্কা সামলাতে না-সামলাতে চলে এল আরও বাধা-বিপদ। দশটি গাই-বাছুর বলদ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূতলশায়ী হল। যারা রইল তারা কেউ মাতৃহারা কেউ বৎসহারা। পতিত হল বিঘের পর বিঘে জমি বলদ অভাবে। সামান্য জমিতে যে ফসল ফলল, লোক দিয়ে চাষ করিয়ে তা লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেল। ভাগের ভাগ যাও বা পেলেন চোরে চুরি করে নিল মড়াই ভেঙে। দেখা দিল অভাব-অনটন। স্কুলের পাটও চুকোতে হল বাবাকে। বোনদের পাত্রস্থ করে দিলেন খুবই অল্প বয়সে। সংসার চালাতে চাইলেন দোকানদারি করে। হাটে হাটে মশলা-তেল-ডাল বিক্রি করতে থাকলেন। পারলেন না তাতে লাভবান হতে ব্যবসায়-বুদ্ধি না থাকায়। জমি-জায়গা গাছ-গাছালি জলের দরে বিকিয়ে গেল। শাকপাতা-বাগানের মেটে আলু-ওল-কাঁকরোল খেয়ে জীবন ধারণ। শটী-হলুদ তুলতে গিয়ে কোদালের কোপ মারতেই রক্ত ছুটত ফিনকি দিয়ে। মাটিতে থাকত কচ্ছপ। গাছপালার গোড়ায়—তালবাগানে কচ্ছপ ডিম পাড়ত গর্ত খুঁড়ে। সেই সব দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা হত।

কপালে সুখ না-থাকলে মাথা খুঁড়লেও মেলে না সুখের দেখা।

কত গল্পই করতেন মৃত্যুঞ্জয়। বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে সাংসারিক ধকল সইতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হয়েছিল তাঁকে। ষাট বছর বয়স হতে না হতে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়, মৃত্যুঞ্জয় পরাস্ত হন মৃত্যুর কাছে, শুভেন্দু তখন বছর পনেরোর ছেলে।

দেখতে মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সুপুরুষ, সোজা-সটান লম্বা-চওড়া। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ হলেও চোখে-মুখে ধার ছিল। মৃত্যুঞ্জয় যখন মারা যান শুভেন্দুর মা চৈতালী তখন বেঁচে। তিনিও দেহ রাখেন বছর তিনেক ক্যান্সারে কষ্ট পেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয়ের থাকার মধ্যে ছিল এক জেঠতুতো দাদা। শুভেন্দু

ডাকত তাঁকে রাঙাজেঠু। বছরের পর বছর স্ত্রী-পুত্রসহ শ্বশুরালয়ে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি সাতপুরুষের ভিটেয় মৃত্যুঞ্জয় দেহ রাখার পর। শ্বশুরবাড়ি-টি ছিল গাঁয়ের অদূরেই। সামান্য দিনের ব্যবধানে এদিকে ভাই এবং ওদিকে স্ত্রী-বিয়োগে ভেঙে পড়েছিলেন দেহ-মনে। বয়সকালে রাঙাজেঠুর রাঙাই ছিল গতরখানি। মেদহীন উঁচু লম্বা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। চেহারাটা রাজসিক হলেও ছিলেন হৃতদরিদ্র। যজমানি-পুরোহিতগিরি করে যতটা সম্ভব ততটা বেঁচে-ছিলেন। এক-এক সময় হত নুন আনতে পানতা ফুরোবার দশা। জগৎ-সংসারে বেশির ভাগই নিরন্ন-গরিব-দুঃখী অভাবীদের মেলা। তারাই যেন সৃষ্টিকর্তার বড্ড কাছের বড্ড পছন্দের। চারদিকে এত দারিদ্র্য, এত দরিদ্র জনের ছড়াছড়ি যে তাঁরই ইচ্ছা-বাসনাতে।

বাড়িতে আসবার পর কমদিনই জীবিত ছিলেন রাঙাজেঠু। বাবা-মা-রাঙাজেঠু সামান্য সময়ের ব্যবধানে একজন আর একজনকে পরপর যেন টেনে নিতে থাকলেন।

শুভেন্দু বেড়ে উঠেছিল কষ্টেসৃষ্টে, দরিদ্র পরিবারে। বুঝতে পেরেছিল সে গরিবের ব্যথা, জেনেছিল তাদের সাধ-আশা-স্বপ্ন-ব্যর্থতার কথা। উপলব্ধি করেছিল অর্থ-বিত্ত না থাকলেও যদি থাকে সামর্থ্য-উদ্যম ভাগ্যলক্ষ্মী পারেন না মুখ ঘুরিয়ে নিতে। তাই তো যৎকিঞ্চিৎ সে পেয়েছিল লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা। হেরে গিয়েছিল একটা জায়গায়, সে তারই অপরাধে। ধরে রাখতে পারল না ঘরের লক্ষ্মীকে।

রাঙাজেঠুর ছেলে রজত। শুভেন্দুর গলায় গলায় ভাব রজতের সঙ্গে। রজত ছিল ওর চেয়ে মাস ছয়েকের বড়। হবে না হবে না করে বেশ বয়সকালে ছেলে হয় রাঙাজেঠুর। দু-ভাই দু-বাড়িতে বেড়ে ওঠে। পরিবার টুকরো-পৃথক হলেও অটুট থাকে উভয়ের সৌহার্দ্য সম্পর্ক। এক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই একে অপরের বিপদে-আপদে আসে ছুটে।

পরের মেয়ে ঘরে আনল রজত। ছেলে রাণা থাকত শুভেন্দুর কাছেই। 'বাপী' বলে ডাকত। হাসাহাসি হত তাই নিয়ে।

বলা না, কওয়া না, তেমন ঝগড়াঝাঁটিও নয়। হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হল রজত। যে গেল সে আর এল না ফিরে। বছরের পর বছর রহস্যাবৃত রয়ে গেল তার অন্তর্ধান রহস্যটা। রজত কাজ করত একটা কারখানায়। বন্ধ হল বাঁধাধরা আয়ের পথ কারখানা লকআউট হতেই। তবে বেকার বসে রইল না। কী করবে, পড়াশুনা কম। পাড়ায়-পাড়ায় ফেরি করতে থাকল চুড়ি-সিঁদুর আলতা। মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী মনোহারী দ্রব্যাদি আর পিতৃদেবের পেশাকে গ্রহণ করবে বলে অবসর মতো নাড়াচাড়া করতে থাকল পুরোহিত দর্পণটা। অনিয়মিত হলেও যা পেত মোটা ভাত মোটা-কাপড়ের সংস্থান হবার কথা।

পূরণ হল না স্ত্রী অদ্বিতীয়ার আশা-প্রত্যাশা। মেনে নিতে পারল না সে স্বামীর পেশাকে। চলতে থাকল মতান্তর মনান্তর। রজতের বিবাগী হবার মূলে এটুকুই কি কারণ? গৃহীরা কেন হয় গৃহত্যাগী, কেনই বা সুন্দরী গৃহলক্ষ্মীকে হলাহল জ্ঞানে পরিত্যাগ করে। কেইবা তার খবর রাখে?

আয় অনুপাতে ব্যয় না হওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইল সংসারটা। শুভেন্দু মাথায় তুলে নিল রাণার শিক্ষা, পোশাক-আশাকের ব্যয় বোঝাটা। ও তখন সবে চাকরিটা পেয়েছে।

বউদির মতনই শ্রদ্ধা করত রজতের স্ত্রীকে। 'বউদি' ডেকে ছুটে যেত কাছে শুভেন্দু। অদ্বিতীয়ার এতে আপত্তি—এখন থেকে নাম ধরে ডেকো তুমি আমাকে। বয়েসে আমি ছোট তোমার চেয়ে। তোমার দাদা চলে যেতে আমাকে কেউ-ই আর নাম ধরে ডাকবার নেই। তোমার দাদার মতো 'দ্বিতীয়া' বলেই ডেকো আমাকে।

কথাটা শুনে থমকে গিয়েছিল শুভেন্দু। সম্পর্কে যিনি মাননীয়া,

তাঁকে কী করে নাম ধরে ডাকবে। নাকচ করে দিয়েছিল প্রস্তাবটা। বলেছিল, বউদি তুমি, বউদিই থাকবে।

শ্রদ্ধেয়াকে বসাতে চায় শুভেন্দু শ্রদ্ধা-মর্যাদার আসনে। তবে কোনও একজনকে পছন্দসই কোনও নামে ডাকবার বাসনা তার ছিল। তেমন সুযোগ পাইয়ে দিতে দাদা-বউদি কেউই হল না আগ্রহী। নিজেকেই জুটিয়ে নিতে হল ডাকবার জনকে, সে সব তো অন্য কথা।

এরপর বউদি 'অদ্বিতীয়া' হয়ে রইলেন না বেশিদিন। ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল তাঁর। স্বামীর স্মৃতি ধুয়ে মুছে মন থেকে সরিয়ে দ্বিতীয়বার স্বামী সংগ্রহে ব্রতী হলেন। স্নেহপাশ থেকে সরিয়ে রাণাকে রাখলেন।

একদিন যাঁরা ছিলেন কাছের মানুষ, তাঁদের কেউই আজ আর নেই। নিজের বলতে শুভেন্দুর এখন সবেধন নীলমণি বাপন।

শুভেন্দু গাছতলাটায় বসে কত কী ভাবছিল, ভাবছিল বাপনের কথাও। বাবা বলতে ছেলেটা অজ্ঞান।

বেলা বাড়ছিল, রোদের তেজ তাপ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উদাস হয়ে উঠছিল মনটা। বুকটা তোলপাড় করছিল বাদ্যি-বাজনার আওয়াজে। কতদিনের কত কথাই জাগছিল মনে। এমন সময় ভেসে এসেছিল সুমধুর নারীকণ্ঠ—'খেয়ে নেবে চল।'

বর্ণালীর পরনে লাল পেড়ে সাদা-মাঠা শাড়ি। তাতেই চেহারাটা জেল্লা দিচ্ছিল। ও একটুখানি কালো, বেঁটে, অর্থহীনাও। বিয়ের বাজারে তা-ই বিকোয়নি সহসা। দিলে-থুলে পয়সার জোরে বেটপ গড়ন-পেটনও ঢাকা পড়ে। দোষ-ত্রুটি গুণে পরিণত হয়। শোনা যেত মেয়েরা নাকি 'কুড়িতেই বুড়ি'—সে কথার ভিত্তি কতটা! তা হলে ওর তো বুড়ি হবার কথা এক যুগ আগেই। যথেষ্ট কমবয়সী লাগছিল বর্ণালীকে।

ঘরে এল শুভেন্দু। প্লেটে করে খাবার এনে দিল বর্ণালী। বিয়ের

কনে বলে পারল না নিশ্চল কুঁড়ে হয়ে থাকতে। মা-ও বলে দিলেন শুভেন্দুর কী লাগে না লাগে দেখতে। বলল—'খেয়ে নেওয়া চাই কিন্তু, রাধা-টাধা চলবে না।'

দই, মুড়কি, নারকেল কোরা শুভেন্দুর প্রিয় খাদ্য। ওর খাওয়া-দাওয়া রুচিপছন্দ স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণালীর তো জানতে বুঝতে বাকি নেই।

বর্ণালী বলে—'বিলুর সঙ্গে থেকে টুকটাক কাজ করবে, দেখছি তা তুমি পারবে না। থাক না হয়, কিছুই করতে হবে না তোমাকে। যে-ভাবে রক্তপাত-টাত ঘটিয়ে এসেছ।'

মুড়ি চিবোতে চিবোতে শুভেন্দু বলল—'আমার সামান্য লেগেছে। হুকুম পেলে যা বলবে করব। রোজ রোজ তো নয়। ভাবছি তোমাকে কয়টা কথা বলব।'

—'কী বলবে চটপট বল ?'

—'ধৈর্য-সহ্য রেখে সবই মানিয়ে নিতে হবে তোমাকে।'

—'আর কি কোনও কথা থাকতে নেই ?'

—'আছে। থাকলেও বলব না, ওই কথা-টা যে আজ লাখ কথার এক কথা। জেনে রেখো, এক কাঠি বাজে না কখনও। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে ধৈর্য-সহ্য হারাবার এক হৃদয়বিদারক পরিণতি। মাস-মাইনের চাকরিটা চলে যেতে দাদা তার স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে অক্ষম হল। বিতৃষ্ণা জাগল সংসার ধর্মে। বউদি বাঁচতে চাইল নতুন করে। জেদের বশে একটা কলঙ্ক বয়ে আনল বংশে।'

—'বউদি খারাপ করে নি। তোমাদের ত্রুটি-অন্যায়ও দেখবে। তোমার দাদার কি উচিত হয়েছিল ওভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে কেটে পড়া ?'

—'আমার বিশ্বাস দাদা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপথে-কুপথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়, ঘরে টাকা-পয়সা এনে বউদির মুখে হাসি ফোটাবে বলে। যে পথে কাঁটা বিছানো থাকে, কাঁটা সরিয়ে এগোতে গিয়ে প্রাণ যায়। কথাটা ভাবতেও কষ্ট হয়।'

শুভেন্দু বর্ণালীকে ধৈর্য রাখবার পরামর্শ দিলেও নিজে হয় ধৈর্য-হীন, দুচোখ বেয়ে জল গড়ায়। ঘরে যারা যাতায়াত করছিল তারা দেখে অবস্থাটা, চোখের আড়াল হয় বর্ণালী। এভাবেই ও আড়াল হয়ে যাবে। দেখা-সাক্ষাৎ যেটুকু হবে অফিসেই।

এর আগেও শুভেন্দু এসেছে এ-বাড়িতে। খেয়েছে দেয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে দুজনে খোলামেলাতে। গিয়েছে হাটে-বাজারে, বনবাদাড় পেরিয়ে ইছামতীর তীরে। জলাজঙ্গল ফসলের ক্ষেত, পান বরজ—বাগিচা ছাড়িয়ে গাঙটা। ঝরঝর শব্দ গাছের পাতায়, গাঙের জলে ঢেউ। বসলে উঠতে চায় নি, চোখ ভরে কত কী দেখবার থাকে, বলবার থাকে। যেতে আসতে, পথ চলতে চলতে হয়েছে একটু বা ছোঁয়াছুঁয়ি। তার ভিতর ছিল না দাহ-জ্বালা, উষ্ণতা।

কলকাতার যে পার্কটায় ওরা ঘোরাঘুরি করত, তার নাম রেখেছিল 'জলবায়ু কানন', প্রচুর হাওয়া-বাতাস, পাখির কাকলি কূজন গাছে গাছে। নিচে মানুষের মেলা, খিলখিল হাসি, গুনগুনানি, মাছির ভনভনানি খাবারওয়ালার টুকরিতে।

বিয়ের দিন ঠিক হবার পরদিনই ওরা পার্কে যায়। বিয়ের পর এখানে আর আসা হয় কি না-হয়! কথায় কথায় বর্ণালী বলেছিল—পয়সার সঙ্গে একটু গতর খরচা করবে আমার বিয়েতে। তুমি আমাকে সাতপাকও ঘোরাবে। পারবে না?

শুভেন্দু জবাব দিয়েছিল—সাতপাক কেন! আমি চোদ্দ পাক-ই ঘোরাব তোমাকে, দেখি তো পারি কি না।

ওকে ধরে তুলবে বলে যে-ই এগিয়েছিল শুভেন্দু বর্ণালী পালিয়েছিল দৌড়ে। বলেছিল তোমাকে বিশ্বাস নেই। গায়ে তোমার যেমন অসুরের শক্তি।—কথাটা বলে বর্ণালী হেসে উঠেছিল খিলখিলিয়ে।

ব্যাপারটা যারা দেখেছিল হালকা তামাসা ভাবে নি। শাবাশ শাবাশ করেছিল ওদেরও—একই পথের পথিক ভেবে।

যেদিন পার্কে যেত—যেত বর্ণালীদের বাড়িতে। চাকদায় ফিরতে ফিরতে রাত হত বেশ। স্টেশন থেকে অনেকখানি পথ। রেল লাইন রেখে মাঠ বাগান পেরিয়ে আবার হন্টন। নিঝুম পথ-প্রান্তর-শ্মশান খোলা। হরিধ্বনি দিত শববাহকেরা। শ্মশানে চিতা জ্বলত দাউ-দাউ করে। সেই দিকে তাকিয়ে ও ভাবত কী নিয়ে মানুষের এত দম্ভ, অহংকার। কিছুই তো নয় চিরস্থায়ী? একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার দেহটাও। তার অস্তিত্ব বাপনই বহন করে রাখবে। বাপন মানুষ হয় তো পতনের পর আনবে উত্থান। আকালের পর যেমন কাল।

থেকে থেকে শুভেন্দু আনমনা হয়ে পড়ে। প্লেটটা পরিষ্কার করে সরিয়ে রাখে। উঠে দাঁড়ায় কোথাও যাবে বলে। থমকে থেমে যায় বর্ণালীর কণ্ঠ ভেসে আসতেই—

ওগো প্রিয় বন্ধু আমি ভুলিনি তোমার ভুলিনি।
তুমি নিরাশায় আশা আঁধার রাতে গো চাঁদ।
পথহারাদের পথেরই দিশা
ভালবাসাতেই তোমার পরিচয়
ভালবাসা আর কিছু নয় সে যে এক আলো,
সেই আলো হৃদয়ের ব্যথা জ্বালা ঘুচালো,
বার বার আমি বলব যা কিছু পেলাম
সে তোমারই জন্য, ধন্য আজ আমি ধন্য।

বর্ণালীর গাওয়া গান গুঞ্জরিত হতে থাকে শুভেন্দুর মনে। কাদের দেখতে পেয়ে সে রাস্তার দিকে চলে যায়।

তত্ত্বতালাশ নিয়ে আসেন পাত্রপক্ষীয়রা। মাছ-দই-মিষ্টি-হলুদবাটা — তাঁতের শাড়ি, বেনারসী, সৌন্দর্যচর্চার প্রসাধনী একটা ট্রেতে করে। নবদম্পতির মঙ্গল কামনায় এই তত্ত্বদান।

সময় এগিয়ে চলে। বর্ণালী হয়ে ওঠে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। সে আরও গয়না পরে। হাতে বাউটি, গলায় হার, কানে দুল। মেয়ে-বউরা ওকে রাখে আগলে আগলে।

মেয়েদের 'জটলা, হৈ-চৈ রেখে শুভেন্দু চলে এল রাস্তার দিকে। একটা পোড়ো বাড়ির রোয়াকে বসল এসে উদাস উন্মনা হয়ে। একলার চেয়ে দোকলা ভাল। এক একদিন এক এক সময় যে তার দোকলা হত, সে তো যাবার পথে। একসঙ্গে অনেকটা চলে এসে দুদিকে গতি নেবে এবার দুজনের রাস্তা।

একটা পাখি 'হা-টি-টি হা-টি-টি' রবে ডাকতে ডাকতে আকাশের বুক চিরে চলে গেল। চোখের সামনে দেখতে পেল বাপনের মুখটা। বিয়ে বাড়িতে দায় হত ওকে সামলানো। শুভেন্দু ওকে তাই নিয়ে আসে নি। ছেলেটা বকবক করত অবিরাম, যা কথা শিখেছে। আধো-আধো বুলিতে অনেক কথা বলে—'বাবা তি ডাতল, ত্যানো ডাতল, তেমন তরে ডাতলে?'—প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কি শেষ ছিল।

'এই যে শুভেন্দুবাবু। কখন এয়েছেন?'—ভবনাথ চৌধুরীর গলা।

শুভেন্দু বলল—'সকালেই এলাম। ফুরফুরে হাওয়াতে একটু বসেছি, শরীরটা জুড়োচ্ছি। ও-বাড়িতেই চললেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, যাব বলেই বেরিয়েছি, আপনাকে পেলাম যখন একটু বসেই যাই। সেবার 'নাগরাজ কলোনী' ছেড়ে না এলে এমন গ্রাম্য পরিবেশ পেতাম কোথায়।'

—'বর্ণালীর মা-বাবার সঙ্গেই তো আপনি দেশ ছেড়েছিলেন। কলোনীতে পুনর্বাসন পেয়েও থাকেন নি।'

—'নানা কারণেই চলে আসি। বর্ণালীদেরও আনি। বর্ণালীর মা ভারতী আমার দিদি। বিদঘুটে পরিবেশের সঙ্গে ওরাও পারল না খাপ খাইয়ে নিতে। সে সময়ে ওই কলোনীতে শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থাটা ছিল রীতিমত বেহাল। একটা-দুটো প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠলেও সেই সব স্কুল বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন রীতি-পদ্ধতি যা ছিল কহতব্য নয়। স্থানীয় স্তরে যোগ্যতম শিক্ষকেরও ছিল অভাব॥ সকালে-বিকেলে যাঁকে দেখতাম খালি পায়ে ঝাঁকা মাথায় বাজার বেসাত করতে, ভুষো কালির মতন যার গায়ের রঙ, তেলচিটে ফতুয়া গায়ে তিনিও 'মাস্টর' - সেই সঙ্গে এঁরাও ছিলেন, কারো পায়ে গোদ, কেউ খোঁড়া কানা, সত্তরের ঘরে পা ফেলা বুড়ো-হাবড়া। নিজে অশিক্ষিত হলেও এ বোধ-বুদ্ধিটুকু জন্মেছিল, শিক্ষকদের এমন হওয়া চাই, যাঁদের দেখলে শ্রদ্ধাভক্তি সম্ভ্রম জাগবে। তাঁরা হবেন কিছুটা সুশ্রী, সর্বাঙ্গ সুন্দর।'

—'চেহারা খারাপ-ভালতে কি আসে যায়। মাস্টারি করার যোগ্যতা থাকলেই হল। তাঁরা অশিক্ষিত গবেট ছিলেন না নিশ্চয়ই।'

—'শুনুনই না। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সে বিচার পরে করবেন। এক পণ্ডিতমশায় ছিলেন বুড়ো থুত্থুড়ে। ছাত্রদের পড়া ধরতেন চোখের কোলে বই নিয়ে। লিখতেন অসমান লাইনে অসমান অক্ষর। চলতেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভুলচুকও যে না করতেন তা নয়। 'স্যার আপনার ভুল হচ্ছে।'—ছ-সাত বছরের এক ছাত্রের কথা শুনেও ঢোক গিলতেন, বলে উঠতেন—'ভুল কোথায় করেছি দেখিয়ে দেরে, শুধরে দিচ্ছি।'—তাঁর বক্তব্যটাকে একটু শুদ্ধ করে বললাম। যারা পড়াতেন তাঁদের মাতৃভাষায় পড়ানোর কতিপয় নমুনা, কয়েকটি শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গি ছিল এই রকম—'পরো (পড়) স্বরে অ, স্বরে আ।'— 'বয়ে শুন্য র, ডয়ে শুন্য র (ড়), ঢয়ে শুন্য র-অ (ঢ়)।' কত বলব?— 'দ্যাশ (দেশ ', দ্যাবতা (দেবতা), য়েক (এক), একারে (একেবারে), ব্যাবাক (সব), ব্যাকে (সবাই)'—'বোর্ডের যন ব্যাকে ফিরি চাও।' —মানেটা হল প্রত্যেকেই তোমরা ব্লাকবোর্ডের দিকে নজর দাও।

স্বভাবতই শিশুছাত্ররা শিক্ষকদের মুখে শুনে শুনেই অমার্জিত বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ত।'

—'আশা করি ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মায়ের কথাবার্তাও খুব মার্জিত, ব্যাকরণভিত্তিক ছিল না।'

—'কারও ছিল কারও ছিল না। আমরাও তো ও-পারের লোক, আমাদের কথা শুনে ধরতে পারেন কি, আমরা 'ঘটি' না 'বাঙাল'। সে যাক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরা আকাট গো-মূর্খ নন, পেটে যাঁদের কালির দাগ আছে, কেন তাঁরা পরিচ্ছন্ন-মার্জিত-রুচিবান হবেন না, বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী? তাঁদের কি সাজে যা-তা বলা বা করা?—বাঁদরামোরও সীমা আছে।—জনৈক শিক্ষাদাতার ঘুম পেল ক্লাসে এসে। নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেনও। তারপর জেগে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছাত্রমহলকে যে নির্দেশ দিলেন, সে তাঁর আচার্যমনের পরিচায়ক কি না সেটা আপনিই বিচার করুন শুভেন্দু-বাবু। নির্দেশটা ছিল—'তরা (তোরা) পাল্লাদি (পাল্লা দিয়ে) আঁর ছুল (আমার চুল) বাছি (বেছে) দেরে মনারা।'—আজ ভাগে-যোগে পাকা চুল বেছে দাও, কাল হাত-পা টিপে দাও। বরাতজোরে আমাদের কেউ পড়ে নি ওঁদের পাল্লায়। কোনও এক অজানা যুদ্ধাস্ত্র বিস্ফোরণে বর্ণালীর কাকা-কাকিমার দেহান্ত ঘটায় অবস্থাটা হল, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' খারাপ লেগেছিল মানুষের অন্যায়-দুর্নীতিও। রাতারাতি নাম-পদবি গোপন করল কেউ কেউ, সমাজে সম্মান পেতে, সুবিধা-সুযোগ আদায় করতে। কত দেবনাথ-ঢুলি-মালি বনে গেল চক্রবর্ত্তী-চ্যাটার্জি-ঘোষ-বসু। এক গাঁ-গ্রামের লোকেরা এসে ফাঁস করে দিল গোপন-মিথ্যে পরিচয়ের কথা। বসন্ত দেবনাথ নামের লোকটা বসন্ত চাটুজ্যে সেজে পুত্রবধূ করে আনল কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়েকে। এদিকে তার পূর্বপরিচিতরা সাবেক পদবি উল্লেখে চিঠিপত্র লিখে আসছিল। পরে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল দু-একজন খোঁজাখুঁজি করতে এসে।'

—'পালটা-পালটির ব্যাপারটা এখনও রয়েছে ভবনাথদা। লোকে চাইছে উঁচু থেকে এস-সি, এস-টিতে নেমে আসতে, ধরা পড়ে শাস্তিও পাচ্ছে। পরচর্চা না করে ওঠা যাক এবারে। আমাদের হাঁড়ির চিন্তাটাও করতে হবে তো।'

—'আরে বসুন বসুন, একটু গল্পগুজবই করা যাক। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, রান্না-বান্না হতে কম-সে-কম একটা বাজবে। বুঝতেই পারছেন কাজ-কর্মের বাড়ি। বসে বসে দেখুন না গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি। জানেন না তো জায়গাটি কী ছিল কী হয়েছে। বসা যেত না এখানে দিনমানেও। কিলবিল করত সাপ-বিছে। আগাছা জঙ্গলময় ছিল চারধারে। খড়বনে থাকত খরগোশ, বনশূকর। যখন তখন বেড়িয়ে বেড়াত ছা-বাচ্চাসহ। এসেছিলাম আমরা নিঝুম বনবাসে। আস্তেসুস্থে লোকবসতি হল, তা-ও এদিকটায় কত খোলা-মেলা জায়গা পড়ে আছে।'

—'সস্তায় জমি কিনে আপনারা এখানে স্থিতি হন সে জানি। আমার অজানা কিছু থাকলে বলুন। কলকাতা অ সবার আগে কোথায় ছিলেন ভবনাথদা?'

—'হাবড়া থেকে চলে যাই বহরমপুর। হাবড়ার অফিসটা ছিল এখান থেকে মাইল চারেক তফাতে। ওখানেই ছিল কর্মচারীদের কোয়ার্টার। আমি থাকতাম অফিসের লাগোয়া কোয়ার্টারেই।—সকালে ঝাড়ুদার এসে বলত দরজা খুলে দিতে। ডিউটি শেষে নাইট গার্ড অফিস খোলবার চাবি দিয়ে আসত আমাকে, যখন তখন আমার ডাক পড়ত, ভোর সকালে। সন্ধ্যা রাত্রে খুলে দিতে হত অফিসের দরজা। বাজার থাল হাতে দেখা দিতেন কেউ 'ওরে ভব, বাজারটা দিয়ে আয় তো আমার ঘরে।' বাবু দুপুরবেলা ঘরে যাবেন, খেয়ে-দেয়ে গড়িয়ে নেবেন বিছানায়। বেলাবেলি আর একবার ঢুকবেন অফিসে, কিছুই বলবার নেই। সকাল সকাল এসে চুকিয়ে গিয়েছেন যে সেদিনকার কাজ। সবার কাজ মিটলেও আমার কাজ মিটত না।

কী না করতে হয়েছে আমাকে! বর্তমানে যারা সাব অ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার তখন তাঁদের বলা হত ওভারসিয়ার অ্যাস্টিমেটর বা সেকশানাল অফিসার। অফিসে এসে নড়তেই চাইতেন না বাবু-সাহেবেরা। রাত্রে হত বাড়তি কাজ। নাইটগার্ড বেশি রাত্রে এসে শুত। কাজের ধকলটা যেত আমার উপর দিয়ে। কিছুটা আলো কিছুটা অন্ধকারে বিল পাশ করে ঠিকাদারের হাতে চেক তুলে দেবার জন্য তাদের সে কি গরজ! যাঁকে যাঁকে দরকার আনিয়ে নেওয়া হাত ঠিকাদারের গাড়ি পাঠিয়ে। আহার-নিদ্রা ভুলে হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়তেন ক্যাশিয়ার অ্যাকাউণ্টটেণ্ট বাবুরা। হ্যাজাক টেবিল-ল্যাম্প ধরানো, টানাপাখার কপিকল টানা কী না করতে হয়েছে। যেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী গতিতে আনাগোনা ছিল লক্ষটাকার ব্যাপারীদের। ছুটি দেওয়া হত আমাকে কিছুক্ষণ। খেয়ে আয় ঘুমিয়ে পড়িস না রে। আবার আসবি যখন ডাকব।'

—'এই অতিরিক্ত খাটুনিটা পুষিয়েও তো নিতেন পয়সা-কড়ি পেয়ে।'

—'কে দেবে! ওভারটাইমেরও তো বালাই ছিল না, ছিল বকশিস। ওসব চাই-ও নি পাই-ও নি।'

—'ছেলেকে মা-ই-দুধ দেয় না না-চাইলে। ওদের মগজে রাখা উচিত ছিল আপনার প্রাপ্যের কথাটা।'

—'হাত পেতে ফকিরের ভিক্ষে নেবার প্রত্যাশী হইনি। ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করিনি। যারা চেয়ে-মেগে নিত তারা বলত, আমরা হচ্ছি পিয়ন, পিয়নদের প্রয়োজন কম। তাদের বিচারে তাই চাইলে দু-একটাকার বেশি কেউ দেয় না। তেলা মাথাতেই তেল পড়ে।'

—'তা বটে, এদিকে যে তেল না পড়ে কাঠ ফাটা রোদ পড়ছে আমাদের মাথায়। ভবনাথদা এবার কি ও-বাড়ির দিকে এগোবেন?'

—'পরে এগোন যাবেখন, পিছিয়ে গিয়েছি যখন আর একটু পিছিয়ে যাই। আমার মতো রোদকে আড়াল করে বসুন না। এই

রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে সে-সময়ে অনেকে মাথায় পরতেন শোলার হ্যাট। কোট-প্যান্ট-হ্যাট-বুট পরা ইঞ্জিনিয়ার-ওভারসিয়ার-স্টোর-কিপারদের আদব-কায়দা ছিল সাহেবি-সাহেবি। সাইকেলে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আসতেন এক-একজন বাঙালী সাহেব। রাস্তায় ছুটে গিয়ে হাত থেকে নিয়ে আসতে হত সাইকেল। মনিবের হুকুম যে-টুকু যা পালন করেছি আমি, সে অফিসেই। কয়েকজন কাজ করত অফিসারদের কোয়ার্টারেও। জল-তোলা, বাসন-মাজা, ঘর-পোঁছা, কাপড় কাচা, বাচ্চা-ধরা। অফিসে দেখা যেত তাদের শুধু মাইনের দিনে। খাতাপত্রে কেউ আর্দালী, কেউ গার্ড, কেউ খালাসী। সরকার দিতেন মাইনে; সাহেব জোগাতেন খাওয়া-পরা, পুজোপার্বণে বকশিশ পারিতোষিক। তাদের মধ্যে বাবু তো বাবু ছিল ছট্টু সিং, যদু রায়, দিবাকর বেয়ারা। সাহেব-অফিসারদের বাতিল করা স্যুট-বুট পরে এত ছিমছাম হয়ে উঠত যে চেনাই যেত না। মেয়ের বিয়ে দিতে, জমি-বলদ কিনতে বেগ পেত না তারা। এদিকে পারতাম না আমি সংসারের ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাতে। মুখ ভার করে থাকত গোপালের মা, দুঃখ-অনুযোগ জানাত। কোনদিনই পারিনি অভাব-অভিযোগ ঘোচাতে, তার কোনও শখ পূরণ করতে। দু-দুবার পদোন্নতি হলেও আর্থিক উন্নতি হয় নি।'

—'হীরেনের যে-দশা, আপনারও তাই। একটা পাশ দিয়ে যদি কেরানীও হতে পারতেন। দেখলাম তো লোককে কতভাবে মাধ্যমিক পাশ করতে। হরিপদ কী করেছিল জানেন?'

—'তা আর জানিনে! নিজের মাথায় তো ছিল গোবর পোরা। ওর হয়ে পরীক্ষায় বসেছিল হারাধন রায়। সে-সব বলে তো লাভ নেই। আমি সৎ-নির্লোভ হয়ে কর্মজীবনটা কাটাতে চেয়েছি।'

—'আপনার কষ্টসহিষ্ণুতা, সততা দৃষ্টান্তবিশেষ। কাজ-কর্মে সুনাম থাকায় হেড অফিসে নিয়ে নেওয়া হয় আপনাকে।

বিলু আসছে। ওকে দেখে নীরবে তাকিয়ে রইল দুজনে। বিলু

বলল—'সবারই চান-টান হয়ে গেছে মামু। এখনই খেতে বসানো হবে।'

সামান্যই পথ। বিলু ওদের নিয়ে এল সাইকেলের সামনে-পিছনে বসিয়ে।

খেয়ে উঠে ভবনাথ বলল—'আমার ফাঁকা বাড়িতে চলুন শুভেন্দু-বাবু। ঘর বাঁধবার আগেকার কিছু ঘটনা শুনবেন, নিরিবিলিতে বিশ্রামও করবেন।'

হল না যাওয়া। যাদের-যাদের আসবার কথা তারা আসতে থাকল। বিয়ে বাড়ি বলে কথা, হাতে হাত মিলিয়ে শুভকর্ম উদ্ধার করে দিতে হবে। কিছু কিছু দায়িত্বও বর্তাল। মাজায় গামছা জড়িয়ে এগিয়ে গেল ভবনাথ। মাংসটা সে-ই রান্না করবে। চাটনির আনারস কাটতে বসল শুভেন্দু। ভবনাথ হাতা-খুনতি নাড়তে নাড়তে শোনাতে থাকল না-বলা কথা—'যশোর জেলা থেকে আসি আমরা শিয়ালদা। সেখান থেকে হাওড়া ব্রিজের গায়ে উদ্বাস্তু শিবিরে। টালির ছাউনি দেওয়া ঘরে। পরে গেলাম আন্দুল। সাময়িক আশ্রয় দিয়ে খোলা হল লঙ্গরখানা। খাদ্য বলতে মাথা পিছু একটু ডাল, আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট; ফ্যানা ফ্যানা ভাত। দুপুরবেলাতে সন্ধ্যা-সকালে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজত। থালা বাসন নিয়ে ছুটতে হত ভাতের লাইনে। গা গুলাত ভাতের পচা গন্ধে, ডাল যেন হলুদ গোলা বিস্বাদ জল। কোনও কোনও দিন বরাদ্দ থাকত কচুরমুখি অথবা পেঁপের তরকারি। দিনের রোদ পড়ে এলে শীতের কুয়াশা জমত। ভেসে আসত কাছাকাছি থেকে গু-মুতের দুর্গন্ধ হিমেল হাওয়ায়।—ক্যাম্পের দুদিকে পাঁচিল, দুদিক খোলা। একদিকে রেলপথ; অপরদিকে পৌরসভার ময়লা ফেলবার মাঠ। প্রচুর জায়গা জমি জুড়ে আনাজপাতি, কপির ক্ষেত। একদিন এল পুনর্বসতির ডাক। এনে ফেলা হল আমাদের চাঁদমারী স্টেশনে—বর্তমানে নাম যার কল্যাণী। কল্যাণী শহর সবে তখন তৈরি হচ্ছে। পাশেই ছিল ঘোষপাড়া। ঘোষপাড়ায়

সতীমায়ের মেলা বসত সে তো জানেন।'

—'ঘোষপাড়ার মেলা' জন্মাবার পর থেকেই দেখে আসছি। জায়গাটা বড় বড় গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ ছিল। স্টেশনের আশ-পাশটাও ছিল জঙ্গলময়। কোন্ দিকটায় আপনারা ছিলেন?'

—'টিনের শেড দেওয়া একটা গুদাম ঘর দেখেছেন? দেখেন নি তো! গুদাম ঘরটা ছিল স্টেশনের পুব দিকে। পাশে ছিল ঝোপ জঙ্গল, খেজুর বন—তারই ভেতর জুটল একদঙ্গল লোকের আশ্রয়। সাবধান করে দেওয়া হল—নেকড়ে আছে, হায়না আছে, দাঁতাল শুয়োরেরও অভাব নেই। অন্ধকারে রাত্রে কেউ বেরবেন না। ঝিলের জলটাও ব্যবহার করবেন না। ওতে ফেলা হয় যক্ষ্মারোগীদের যত ময়লা নোংরা। রাতটুকু কোনগতিকে কাটিয়ে চলে এলাম চাঁদমারী শিবিরে। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড মিলিয়ে মস্তবড় উদ্বাস্তু শিবির। শিবিরের সর্বময় কর্তা ছিলেন কমাণ্ডার। ওয়ার্ড পিছু একজন করে সুপারিণ্টেনডেণ্টও ছিলেন। রান্না খাবার না দিয়ে দেওয়া হত 'ডোল'। ক্যাশডোল-ড্রাইডোল, চাল-ডাল নগদ অর্থ। আধপেটা হলেও রুচিসই খাওয়া-দাওয়া, চাহিদা অনুপাতে সবই কেনা যেত দোকান-বাজারে, পয়সা ফেললে কি না মিলত! তাঁবুর তলে জমে উঠল জমজমাট ব্যবসা। আদিম ব্যবসাও। ওপারের সীমানা পেরিয়ে এসে অভাবে হোক স্বভাবে হোক, ব্যবসাটা ফেঁদে ছিল। তাদের কাছে ভিড়তও এক শ্রেণীর খরিদ্দার। সে-সব আমরা বরদাস্ত করিনি। হটিয়ে দিয়েছিলাম নোংরা কারবারিদের।'

—'আপনারা কবে হটলেন তাই বলুন। আমি আপনাদের কথাই জানতে আগ্রহী।'

—'কথায় কথা ওঠে। হেনস্তার কি অন্ত ছিল। পুনর্বসতির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও—সহজে সে সুযোগ মিলল না আমাদের। বর্ণালীর কাকা-কাকিমা এলেন। আমরা যেখানে যাব—তাঁরাও যাবেন। তাঁবুর ধার দিয়ে সবজি বোনা হল, ফুলগাছ লাগানো

হল। এ থেকেই বুঝতে পারছেন আমরা এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছিলাম। দিন গেল, মাস গেল, ঝড় বাদল এল। বৃষ্টি হলেই ঝাঁপিয়ে তাঁবুতে বাইরের জল এসে ঢুকত, তাঁবু উলটে-পালটে দিত। বর্ষা-বাদলে ফাঁকা মাঠ থেকে চলে এলাম আমবাগানের উঁচু জায়গাটায়। তাতেও হল না মুশকিল আসান। তাঁবুর খুঁটি ছুটো পেটাতে হত। ঢিলে হয়ে যাওয়া দড়ি টেনে বাঁধতে হত। দড়ি ছিঁড়ে গেলে নতুন দড়ি সংগ্রহ করতে হত। যে খুঁটির সঙ্গে দড়িছড়া বাঁধা থাকত, সেটা ভেঙে গেলে, পেটাতে পেটাতে ভোঁতা হয়ে গেলে, সুচালো খুঁটি আনতে হত; যাই করা হোক, ঝড় বইতে থাকলে জলের ছাঁট আসত, তাঁবুর দড়ি বাড়ি খেত, ঝটপট করত। বিছানা-কাঁথা সেরে সামলে রাখতে হত। অবিশ্রান্ত বর্ষণ ঝড়ের মাতন কমতে চাইত না। রাত-ভোর তাঁবুর খুঁটি ধরে বসে থাকতাম স্বামী-স্ত্রী। ধপাস করে তাঁবু পড়ে গেলে চলে যেতাম ব্যারাক ঘরগুলিতে। সে ঘরে যারা থাকত তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে যেতাম। ওপরে ঢেউ খেলানো টিন। টিনের গরম কমাতে মাচা-পাটাতন। চামচিকে-পেঁচা-পায়রার বাসা, খচখচ কিচিরমিচির শব্দ হত, ডাকাডাকি করত পেঁচা-তক্কেত, অজস্র ছুঁচো ইঁদুর বেড়াত ঘুরে। পড়ে যাওয়া তাঁবু ওঠানো হত পরদিন, যাঁদের তাঁবু পড়ত না, ছিল তাঁদেরও কষ্ট-দুর্ভোগ; সম্ভব হত না বিছানা পাতা, কোলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে, ছালা চট বিছিয়ে বসে বসে রাত্রি জাগরণ। পরিস্থিতিটা চিন্তা করুন শুভেন্দুবাবু।'

—'একে বলা চলে অবর্ণনীয় দুঃখ-ক্লেশ, হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, গরু-ভেড়া বাসেরও অযোগ্য স্থানে পড়ে থাকতে হয়েছিল আপনাদের। তাঁবুর তলা থেকে কবে আপনাদের রেহাই মিলল?'

—'ছাড়তে চাইলেও তাঁবু আমাদের ছাড়ল না। বছর ঘুরে গেল ঘর-হারা মানুষের কাছে ঘর বাঁধবার ডাক আসতে। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চললাম আবার। খাঁ-খাঁ মাঠে দুপুর গরমে তাঁবুই ভরসা। এক কালে

গাছপালা ছিল সে মাঠে। ছিল আম-কাঁঠাল-বেলগাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সে গাছ তো 'লাকড়ি' সন্ধানীরা আগেই খতম করেছিল, থাকার মধ্যে ছিল আদ্যিকালের কয়েকটি বট-অশ্বত্থ বৃক্ষ। যার তলায় স্কুল খোলা হয়েছিল কালীতলার স্কুল, বটতলার স্কুল নামে। বালি ঢাকা লোহালক্কড়ে পরিপূর্ণ জায়গাটা। ষোল সতেরো বছরের মেয়ে তাঁবুতে ছিল ঘুমিয়ে, গোখরো এসে ছোবল বসাল, বাঁচল না। সাপের কামড়ে কতজনের ভবলীলা মিটে গেল। বৃদ্ধ-যুবা-নারী-পুরুষ-শিশু অনেকেই মারা পড়ল। সাপে যখন প্রথম কেটেছে কেউ তাগাও বাঁধে নি, তাগা বাঁধলেও রক্ষা পায় নি ; ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকে নাগ-নাগিনী-চন্দ্রবোড়া-গোখরো-কেউটে, তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে দেয় সাক্ষাৎ শমন—শিরে হানে আঘাত। সাপের অত্যাচার ঘর বাঁধবার পরেও নাকি থামে নি। তাই তো উপনিবেশটার নামকরণ হয়ে যায় 'নাগরাজ কলোনী'—কতভাবেই যে কতজনের মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়েছে ; কে জানত আর এক শমন লুকিয়েছিল মাটিতেও। যুদ্ধের আমলে গড়া হয়েছিল সেখানে মিলিটারী ছাউনি, ব্যবহারিত-অব্যবহারিত টোটা-গোলা-বারুদ মিলিটারীরা ফেলে রেখে সরে পড়েছিল, যার মারাত্মক ফল পেল নির্দোষ আনাড়িরা। দুপুরে একদিন তুলকালাম কাণ্ড। ভেসে এল গোলাগুলির শব্দ, কলোনী আক্রান্ত হল না তো! কলোনীতে একবার চড়াও হয়েছিল পাশের গ্রামবাসীরা। কলোনী থেকে কেউ কেউ বেরত রান্নার জ্বালানি ও লাউ-কুমড়ো-শসা গাছের মাচায় দেবার জন্য কঞ্চি-কাঠ সংগ্রহে। তাতেও পারত না সন্তুষ্ট থাকতে যারা সুযোগ সন্ধানী। হাঁস-মুরগি-ছাগল-পাঁঠা-গাই-বাছুর আনত চুরি-চামারি করে। সাতে-পাঁচে থাকত না সে-গাঁয়ের সাঁওতাল আদিবাসী-সম্প্রদায়। শান্ত লোকগুলো একদিন অশান্ত হল, খেপে উঠল জোয়ান-মরদ নারীপুরুষ। বেরিয়েছিল তারা বল্লম-তীর-ধনুক আর শিকারসন্ধানী কুকুর নিয়ে, খটাস-বনবিড়াল-খরগোশ-পাখি যা পাবে তাই মেরে

ধরে আনতে। এদিক থেকেও কয়েকজন বোম-পটকা-দা-কুড়ুল হাতে তাদের গাঁয়েই যাচ্ছিল। দেখে তো রাগে ফেটে পড়ে—'এদিক ছাড়ি যা তুরা এগোবি তো গর্দান লামিয়ে দিব।'

ধেয়ে আসে তাড়া করে। এরাও কম যায় না, পিছিয়ে আসার পাত্তর কেউ নয়। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ে, মার খায় যেমন তেমনি মারও দেয়। সেই হিংসাশ্রয়ী সংঘর্ষে জখম হয়ে মারা পড়ে দুপক্ষের লোকই। তেমন কিছু কি ঘটল? যে যেখানে ছিল ছুটতে থাকল। আমাদের তাঁবুটার পাশেই লোকে লোকময়। বর্ণালীর কাকা-কাকিমার কাপড়-চোপড় রক্তে ছোপানো। বিকৃত দেহ চেনবার উপায় নেই, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল শরীরের বিভিন্ন অংশ। শুভেন্দুবাবু, কীভাবে ঘটে দুর্ঘটনাটা জেনে আশ্চর্য হবেন। কয়লা ভাঙবে বলে বর্ণালীর কাকা একটা লোহার ডাণ্ডা কুড়িয়ে আনে, হাত খানেক লম্বা ইঞ্চিখানেক মোটা 'রড' একখানি, সেটাকে দুম-দাম মারতে থাকে কয়লার ওপর। ভাঙাও হয়ে যায় কতকগুলো কয়লা, ঘাইয়ের পর ঘাই মারতে মারতে বিস্ফোরণের আওয়াজ, সে কী গুড়ুম গুড়ুম, দুড়ুম দুড়ুম—তাতেই সব শেষ। কাকিমা একটু আগেই এসেছিল কাকাকে ডাকতে—'কত বেলা হয়েছে, খেয়ে দেয়ে নাও।'—বর্ণালীর তখন ভাল জ্ঞান হয় নি, ওদের পাশের তাঁবুতেই এ অঘটন। তার পরের তাঁবুতে থাকতাম আমি ও আমার স্ত্রী। বীভৎস দৃশ্যটা মনে গেঁথে আছে। বর্ণালীর কাকার জড়পিণ্ডটা থরথরিয়ে কাঁপছিল, কাঁপছিল ওর কাকিমার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ধড়টাও। যেয়েও যেতে চাইছিল না প্রাণটা। এর নামই নিয়তি।'

—'এ যে মানুষের হাতে গড়া নিয়তি, ভবনাথদা! সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা শুধু আজ নয়, অতীতেও ছিল। কম ছিনিমিনি খেলা হত না মানুষের জীবন নিয়ে। যাঁরা সরকারের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতেন কোনও প্রকল্প রূপায়ণে, তাঁদেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি বাধ্য করেছে আপনাদের গুণগার দিতে। ফাঁকা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল

দেশময়। অস্থায়ী ক্যাম্প না বানিয়ে সরাসরি কলোনীতেই বসিয়ে দেওয়া যেত উদ্বাস্তুদের, শহরের আশপাশের জায়গাগুলিতে। যারা কষ্ট করল তারা সে কষ্টের মূল্য পেল না। বলা যেতে পারে, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীরের সঙ্গে বাস করে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে যারা পুনর্বসতির ধ্যান করে এল দিনের পর দিন, তাদের ঠকানো হল। ভাল জমি-জায়গাগুলো দখল করে নিল জবরদখলকারীরা, পেয়ে গেল বৈধ মালিকানাও। যেখানে আপনাদের পাঠানো হল সে জায়গা বাসোপযোগী কি-না যাচাই করার প্রয়োজন ছিল। যে-ভাগাড়েই আপনাদের নিয়ে ফেলা হোক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিছু থাকলে তাকে ধ্বংস করা অসম্ভব হত না, সে মাটিতে সাপ-ব্যাঙ যাই থাকুক, অবশ্যই প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া যেত।'

*

*　　　*

শুভেন্দুর আনারস ছাড়ানো-কাটা শেষ। মাজাটা ধরে গেছে, সে উঠে পড়ল। বাইরে এসে দেখল অফিসের সহকর্মীরা এসেছে। এসেছে নীহার-যূথিকা-বাপ্পাদিত্য-রেখা, সোমনাথদাও এসেছেন। ডাকতে ডাকতে ভবনাথের কাছে এগিয়ে গেলেন—'তোমাগো ছ্যাশে আইসা পড়লাম ভবনাথ। খায়োন-দায়োনের ব্যবস্থাটা ছ্যাখত্যাছি খারাপ কর নাই। মাংসটা ঢাকা দিয়া ছ্যাও, সিদ্ধ জানি হয়।'

—'আপনার পদধূলি পড়েছে, এ আমাদের সৌভাগ্য ভবনাথদা।'

—'নিমন্ত্রণ করছো যখন ক্যান আসুম না। তোমার মাইয়ার বিয়াতেও আমি না-আসা হই নাই, থাইকাও গ্যাছি। খায়োনের পর আমি আবার নড়তে-চড়তে পারি না।'

—'নড়বার প্রশ্ন আজও নেই। রাতটুকু এক বিছানায় কাটিয়ে

দেব দুজনে। ত্রিপলটার নিচে না হয় পড়ে থাকা যাবে, পারবেন না সোমনাথদা?'

—'না পারোনের তো কিছুই নাই। বেশি রাত্র কর্যাইবা না। দূরের থ্যাকা যারা আইছে, আগে ছাইরা দিয়ো।'

জলযোগে বসল অফিসের লোকেরা। শসা-তরমুজের পর লুচি-মিষ্টি। সোমনাথও বসলেন। শুভেন্দুকে আসতে দেখে কে যেন বলল 'কি রে, পায়রা উড়িয়ে দিলি, ধরে রেখে পোষ মানাতে পারলি না?'

আর একজনের মন্তব্য—'কার জিনিস কার ভোগে, একেই বলে নসীব।'

ওদের কথা শুভেন্দুর কানে গেল না। সে এসে জিজ্ঞেস করল—'শ্রীমতীদিকে দেখছি না, তিনি কি আসেন নি?'

উত্তরটা যূথিকা দিল—'ওনার এক আত্মীয়ার বিয়ে তাই আসতে পারেন নি।'

বাপ্পাদিত্য বলল—'দিব্যেন্দুও তো অনুপস্থিত। ওরও কি বিয়ে বাড়ি রয়েছে নাকি?'

নীহার জানাল—'কদিন যাবৎ তার তো দেখাই মিলছে না।'

শুভেন্দু বলল—'ও যে আসবে না জানতাম।'

জলযোগ সারা হলে সবাইকে নিয়ে বাগানের দিকে গেল বর্ণালী। শাক-সবজি বাগান ছাড়িয়ে ফল-ফলারি গাছ।

বর্ণালী আক্ষেপ করে—'আম-কাঁঠাল-লিচুগাছ ফলবন্ত হতে না হতে বাবা মারা গেলেন। গাছের একটা ফলও বাবার মুখে দেওয়া জোটে নি।'

সোমনাথ বললেন—'গাছ রোপণ করে একজনে, ফল খায় অন্যে। বাগানটারে প্রাণ ভরাইয়া সাজাইছিল প্রিয়নাথ। জায়গাখানও বাইছা লইছিল ছাশ-ঘরের মতনই। চক্ষু জুড়াইয়া যায়।'

ভবনাথ মাংসের ডেকচি নামিয়ে রেখে এল, বলল – 'আপনারা

চলুন আমার বাড়িতে-বেড়ানো-বিশ্রাম দুই-ই হবে। শুভেন্দুবাবু, আপনি এদিকে থাকুন। বড়দের কেউ থাকা দরকার।'

একটা মাদুর পেতে গোল হয়ে বসা হল ভবনাথের ঘরের দাওয়ায়। খাটে পাতা বিছানাটায় আধশোয়া হলেন সোমনাথ। জানালেন—'একটু চলাফিরায় দেহডা হাঁপাইয়া আসে। ঘণ্টাখানিক বিশ্রাম লই।'

ভবনাথ বলে—'ঘণ্টাখানেক কেন, যতক্ষণ পারেন বিশ্রাম নিন দাদা। বলতে গেলে আপনার তো পুরো বিশ্রামের দিন ঘনিয়ে এল।'

—'হু, আমি আর মাত্র ছয় মাস আছি।'

—'আমি এখনও থাকব বছর দেড়েক, রিটায়ার করে কয়টা টাকাই বা পেনসান পাব! এখনই চলছে না তো পরে কীভাবে চলবে! মনস্থ করেছি, বাড়ির সামনে একটা মুদিখানা দোকান দেব, সকাল-সন্ধ্যায় আমিই বসব। আমি আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী।'

—'কী কী সহযোগিতা চান বলুন ভবনাথদা?'—নীহার জানতে চায়।

—'কেউ ডাকলে-খুঁজলে পারেন তো সামলাবেন। আমি পাইকারি দরে মশলাপাতি কিনতে বেরব বড়বাজারের দিকে, টিফিন পিরিয়ডে।'

—'টিফিনে কেন, যখন ইচ্ছে বেরিয়ে পড়বেন। সারা জীবন তো দিয়েই গেলেন, কী পেলেন বিনিময়ে?'

সোমনাথ বললেন—'যে যার ধান্দা খুঁইজ্জা বেড়ায়। তুমিও খোঁজো, কত চাকরেগোই তো দেখলাম ডিউটির ধারে-কাছে যায় না, চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান চালায় অফিসের মইধ্যে। কেউ কি তাগো কয় কোনও কথা? ভবনাথ তুমি কোমর বাইন্ধা নাইমা পড়।'

বাপ্পাদিত্য সাহস জোগায়—'ভাববেন না, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

রেখা বলে—'আপনি তো বাড়ি-ঘর তুলে, মেয়ের বিয়ে-থা দিয়ে ধার-দেনায় ডুবেই আছেন ভবনাথ দা, তা থেকে রেহাই পান তো

দেখুন। আপনি চেয়ারে না থাকলে আপনার কাজ আমরাই করে দেব।'

—'কাজ করতে হবে না, কেউ খোঁজাখুঁজি করলে যা বলতে হয় বলে দেবেন।'

নীহার-বাপ্পাদিত্য-যূথিকা-ভবনাথ জমিয়ে তুলল বৈঠকি আসর। ঘর-পর-অফিসের কথা সবই হল, রেখা একখানি গল্পের বই টেনে নিল টেবিলের ওপর থেকে, আর সোমনাথ দেহটা গড়িয়ে দিলেন বিছানায়।

*

* *

বেলা পড়তেই ও-বাড়ি থেকে এল ভবনাথের স্ত্রী, সঙ্গে জামাতা-কন্যা নাতি-নাতনী। এদিকে সন্ধ্যা ঝাঁট দিয়ে সব যাবে।

চা-বিস্কুট খেতে দিল। ডেকে ডেকে ওঠাতে হল সোমনাথকে, সোমনাথ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন—'রাত্রবেলা এইখানে ঘুমামু।'

—'ঠিক আছে, এখানেই ঘুমোবেন! আপনার বিছানা করাই থাকবে।'

ভবনাথ ঘুরে ঘুরে দেখাল বাড়ির চারদিকটা। দোকানের গাঁথনিটা হচ্ছে, তা-ও দেখাল। সম্ভব হলে দোকানটা চালু করবে সে পরের মাসেই।

বসে-জিরিয়ে গল্প করে চলে এল ওরা বিয়ে বাড়িতে। সন্ধ্যা-লগ্নে বিয়ে, বর আনতে গিয়েছিল বিলু। সে ফিরতেই রব উঠল—'বর এসেছে।'—'বর এসেছে।'

বর্ণালীর কাছে কী যেন বলতে এগোচ্ছিল শুভেন্দু। ওকে দেখে বর্ণালী বলল—'যাও ওকে নিয়ে এস, ও-যে তোমারই ভাই।'

আনন্দ-শিহরনের মধ্যে স্পষ্ট-স্বচ্ছন্দ কথা শুনে, বর্ণালীর হাসি মুখ

দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত সে বরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে।

শুভেন্দু তার নতুন ভাইটিকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনল গাড়ি থেকে, ব্যস্ত-ত্রস্ত কন্যাকর্তা বনে গেল।

জামাইকে দেখার জন্য পড়ল হুড়োহুড়ি। নির্দিষ্ট সময়ে ঘর-বার করতে করতে বিবাহ-বাসরে আনা হল শ্রীমান মলয় বাগচীকে, রোগা লিকলিকে উপোসী দুর্বল দেহ। আহা উহু সবারই ওকে নিয়ে।

অনুষ্ঠানের আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করল শুভেন্দু। হল শুভদৃষ্টি, মন্ত্রপাঠ দফায় দফায় উলু, গিঁট পড়ল কাপড়ে-চেলিতে, হাত মেলাল বর্ণালী মলয়ের হাতে, অগ্নি-প্রদক্ষিণ করল। হোম-যজ্ঞ-মন্ত্রপাঠের পর পায়ে পায়ে এল ঘরে। চলতে থাকল হাসি-মস্করা, হাল্কা ধরনের মেয়েলি সংস্কার-আচারনিষ্ঠা।

অপূর্ব লাগছিল ঘোমটা ঢাকা বধূবেশী বর্ণালীকে দেখতে। মনের মিল তাদের হবে-কি-হবে-না যাচাই করা হয় খেলাধূলার ছলে। পাথরবাটিতে জল, জলটা নেড়ে দিয়ে ছাড়া হয় শোলার মাছ। জোড় বাঁধে না, অবশেষে ঘটিয়ে দেওয়া হয় মৎসরূপী বরকনের মিলন। গরম গরম দুধ দেওয়া হয় আলাদা আলাদা কাঁচের গ্লাসে, দুজনের ঠোঁটে ছোঁয়ানো দুধের গ্লাস পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। সেই এঁটো দুধ-প্রসাদ চুমুক লাগিয়ে খেয়ে নেয় ওরা।

মেয়েদের আচার-রীতি ও সবার খাওয়া-দাওয়া চুকতে বেশ রাত হল। চলে গেল অফিস সহকর্মীরা, সোমনাথ থাকলেন। খেয়ে-দেয়ে ধীর-মন্থর কাল যাবেন, ভবনাথের সঙ্গ নিলেন।

ভবনাথ প্রশ্ন করে—'পেট ভরে খেয়েছেন তো সোমনাথদা?'

—'কি যে কও! মাংসটা অত্যন্ত নরম সুস্বাদু আছিল। রাঁধছিলাও মনের মতন কইরা। হাতা চারেক খাইয়া ফ্যালাইছি, জেরোটা মিষ্টি খাইছি দইও খাইছি আড়াইশ তিনশ। খাইয়া তৃপ্তিই পাইলাম।'

—'খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন জেনে ভাল লাগল। আবার আসবেন। মেয়েটাকে পার করতে পারি তো বলব আপনাকে।'

ট্রেন-বাস চড়া, হাঁটাহাঁটি, পরিশ্রম কম হয় নি শুভেন্দুর। ঘুম ঘুম লাগছিল। শুভেন্দু শুয়ে পড়েছিল খানচারেক চেয়ার সাজিয়ে প্যাণ্ডেলের তলে, পা দুটো ধরছিল না, একটা হাতও ঝুলছিল।

'শোবে চল।'—গায়ে ঠেলা মারতেই ছটফটিয়ে উঠে বসল শুভেন্দু। অবিশ্বাস ঘোর লাগল। যে-রাতে হর্ষ-উচ্ছ্বাস-আনন্দে নববধূরা তাদের অতীতটাকে ধুয়ে-মুছে ফেলতে চায় সেই রাতে এল কিনা বর্ণালী তাকে ডাকতে!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল বিলুও—'বিছানা পাতা হয়েছে দাদা, শোবেন আসুন।'

যে-যার তখন শয্যা নিয়েছে। থেকে থেকে বাসরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চোখে যে ঘুমটা নেমেছিল তা কেন যেন উবে গেল শয্যা নিতেই। থেকে থেকে ঝিলিক মারছিল চোট-লাগা হাঁটুতে। শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছিল শুভেন্দু। ভেজানো দরজা গলিয়ে নজর পড়ল তার বাসর ঘরে, বাথরুমে যাবার সময়। আলো জ্বলছিল। মলয় বসেছিল তার চার বন্ধুকে নিয়ে, বর্ণালীও ছিল বসে।

এঁটোকাটা পাতা নিয়ে রাস্তার ওদিকে ঝগড়া করছিল কুকুরের পাল, ঘরে-বাইরে টিমটিম করে জ্বলছিল হ্যারিকেন। মিট মিট করে জ্বলছিল নিভছিল জোনাকি, বর্ণালীও পিটপিট করে তাকাচ্ছিল এক-একবার, স্বল্প আলোকেও সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

বর্ণালী বাইরে এসে বসতে চেয়েছিল শুভেন্দুর মাথার কাছে, এমন সময় ডাক পড়ল—'বউদি, এই বউদি!'

মলয়ের অফিসের বন্ধুরা কেউ ডাকছিল, বর্ণালী যেতেই সরগরম হয়ে উঠল বাসরঘরটা। কখনও গান-বাজনা, কখনও রসালাপ। ভোর ভোর সময়ে যে-যার শয্যা নিল। কেউ ঘুমাল, কেউ গড়াগড়ি দিল শুভেন্দুর মতো।

সকাল সকালই উঠল শুভেন্দু। ফুলের মিষ্টি সুগন্ধ হিমেল বাতাসে, গাছের ডালে; আকাশে পাখির ডাকাডাকি। মিশে গেল ও সুদূর নিলীমায়, যে উড়তে পারে সেও উড়ল ডানা পাখা মেলে, ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ না থেকে।

এদিকে মেয়ে-মহিলারাও ডেকে ডেকে যেন তুলে দিতে চাইল নিদ্রামগ্নদের গান গেয়ে গেয়ে—

রজনী প্রভাত হইলরে শুন সকলে,
ওই বুঝি ডাকে তমালেরে।
শোনরে রাধার বন্ধু হে কুকিল ডাকে,
সিঁদুরের বিন্দু বন্ধুহে, ও বন্ধু লেগেছে কপালে।
মুছে নিয়ো শান্তির অঞ্চলে,
কঙ্কণের চিহ্ন বন্ধু হে, ও বন্ধু তোমার অঙ্গেতে।
লোকে দেখলে কী বলিবে মোরে
ও বন্ধু জাগরে সকালে।
কত মধু আছে বন্ধু তোমার শরীরে
মধুর লোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে।
কত সহে অবলা পরাণেরে
নিশিগত প্রাণনাথ হে।
ও বন্ধু জাগরে সকালে॥

শুভেন্দু পাক দিয়ে আসে মাঠটার ওদিক থেকে। চলে যাবে সে। সবই তো হল দেখা বর্ণালীর বিদায় দৃশ্যটি বাদে। মা-ভাই-আপনজনেরা কাঁদবে। বর্ণালীর চোখেও নামবে জলের ধারা। শোক-

সন্তাপটুকু নাইবা দেখল, চলে আসবে। মা মানা করলেন, বিলুও বাগড়া দিল - 'আপনি আজ থেকে যান দাদা, দিদিও যাবে বাড়ি ফাঁকা করে।'

শুভেন্দুর মনেও শূন্যতা জেগেছিল, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। জানাল—'অফিসে কাজ রয়েছে ভাই। কাজকর্ম সেরে বাড়িতে ফিরব সকাল সকাল। ছেলেটা কীভাবে কাটাচ্ছে কে জানে!'

শুভেন্দু চলে এল। বর্ণালী তাকিয়ে থাকল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

বিয়ের পর বউভাত। একটু তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছল শুভেন্দু; বর্ণালীর হাতে তুলে দিল একতোড়া রজনীগন্ধা।

বর্ণালীর পরনে মেরুন রঙের বেনারসী। গা-জোড়া স্বর্ণাভরণ, কপালে চন্দনফোঁটা। চোখে কাজল, ঠোঁটে-মুখে প্রসাধনী প্রলেপ।

আসতে থাকল নিমন্ত্রিতরা। অফিস থেকেও কয়েকজন এল ভবনাথের সঙ্গে, চলতে থাকল হাসাহাসি, জটলা।

বর্ণালীর চিবুকটা ধরে আদর করলেন শ্রীমতী গুপ্ত। জানালেন —'তোর ডাগর ডাগর চোখে চেয়েছিলাম যে তৃপ্তি-পুলক প্রত্যক্ষ করতে তা আমি দেখতে পাচ্ছি রে। সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়েছিস, এবার সাঁতার কাটতে কাটতে পাড়ি জমা আনন্দ-জোয়ারে, প্রাণের উচ্ছলতায়।'

বর্ণালী বলল - 'নাকানি-চোবানি খেতে থাকি যদি!'

কে যেন বলে উঠল—'উঁহু, নাকানি-চোবানি কেন খাবি। ভোলানাথরূপী মলয়ের সঙ্গে খাবি হাবুডুবু। সেই তোকে কূলে পাড়ে নিয়ে আসবে।'

যূথিকা বলে—'ঘাবড়াস না বর্ণালী। বরটি তোর ভোলানাথই বটে।'

কেউ বলল—'নিশিদিন জপ করবি এই ভোলানাথটির নাম।

যেমন, ভোলে বাবা পার করে গা, বাবা ভোলানাথের চরণে সেবা লাগে—'

একটা হাস্যরোল শোনা গেল মেয়েদের মধ্যে।

আপত্তি তোলে বর্ণালী—'ঠাকুর দেবতার নাম জড়িয়ে ওভাবে ইয়ারকি কর না। কোথায় স্বামী আর কোথায় বাবা ভোলানাথ, 'বাবা' ডাকটার মাধুর্যই তো আলাদা।'

—'আরে বাবা বুঝছিস না! 'বাবা' হল কথার লব্জ-মাত্রা। দিনের মধ্যে কতবার করেই তো বাবা-ডাক এসে যাচ্ছে মুখে, 'হ্যা বাবা'-'ও বাবা'-'না বাবা'। নতুন করে বাবা ডাকটা জুড়তে হবে না, ভোলানাথ বললেও তরে যাবি।'

আবার হাসি, শ্রীমতী কথাগুলো শুনে হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন। আরও নিমন্ত্রণ বাড়ি আছে। সেখানে যাবেন।

খেয়ে-দেয়ে শুভেন্দু চোখ বুলিয়ে এল ফুলশয্যা ঘরে। শয্যায় শোভা পাচ্ছে তারই কিনে দেওয়া খাট-জাজিম-সুজনি-বালিশ-বিছানার চাদর।

বাড়ি ফিরছিল শুভেন্দু লাস্ট রানাঘাট লোকালে। অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছিল ট্রেন সব কিছু পিছনে ফেলে। বর্ণালীকে শুভেন্দু পারছিল না ভুলে থাকতে। কোনও একদিনের কথা পড়ছিল মনে। পার্কে গিয়ে বসতেই বর্ণালী কেন যেন ওর একটুখানি ঘনিষ্ঠ হতে চাইল। ঘামে ভেজা কপালটা দিল মুছিয়ে, বাতাস করল ফোল্ডিং পাখাটা দিয়ে। শুভেন্দুও প্রীতির পরশ ছোঁয়াল বর্ণালীর পিঠে। বলল- 'ইস্, ঘেমে যে জল হয়ে গেছ তুমি।'

বর্ণালী তার অন্তর্বাসের হুকটা আলগা করে দেয়। বলে- 'তুমি কি ঘাম-জলটুকুই টের পেলে? আর কিছুই কি দেখতে পেলে না শুভেন্দু।'

—'কী দেখব, তোমার শিরদাঁড়া-টা কেমন যেন খোয়া ওঠা রাস্তা।'

—'যাই বল না কেন! লোভ আর হিংসা থেকেই এর উৎপত্তি।

নাগরাজ কলোনীতে ছিলাম, বাপনের বয়সী হব কি হব না, হামাগুড়ি দিতে দিতে চলে গিয়েছিলাম পাশের তাঁবুতে। কাকিমা লুচি ভাজছিলেন, গিয়ে টানাটানি করছিলাম আমি ওঁর আঁচল ধরে। হাতের নাগালে যা পাচ্ছিলাম, ফেলছিলাম ছুঁড়ে। কাকিমা ছিলেন হিংসুটে, একলসেঁড়ে। পরে শুনেছি, আমার কাকা আলাদা সংসার পেতে ছিলেন তাঁরই কুমন্ত্রণায়। কতবার গা বেয়ে উঠলাম, কাকিমা ফিরেও তাকালেন না। লুচি ভাজছিলেন আপন মনে। চাপড় মারছিলাম ওঁর গায়ে খেলাচ্ছলে। থেকে থেকে কাঁদছিলামও। মা এসে দেখে গেলেন অবস্থাটা। কে জানত, আসল নাগিনীর চেয়েও যে কাকিমা হয়ে উঠবেন ভয়ঙ্করী, তখনই গর্জে উঠে বিষদাঁত বসাবেন। হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলাম নাগিনীর মাথায়-মুখে, চুল ধরে টানছিলামও। কত আর সইবেন। ফোঁস-ফোঁসানির পর দংশন। ঝাঁঝরিখানা আস্তুল পিঠে এসে পড়তেই ছড়িয়ে পড়ল গরম ঘি। এটা সেই চিহ্ন গো। তোমার 'খোয়া ওঠা রাস্তা' গো।'

শুভেন্দু কম অবাক হয় নি কথাটা শুনে। নিষ্পাপ-অবুঝ শিশুর উপর মাতৃসমা কেউ যে অমন আঘাত হানতে পারে সে অভিজ্ঞতা তার ছিল না।

*

*

দুদিনের পথ চলার সঙ্গীকে ছেড়ে বর্ণালী পেয়েছে তার চিরসঙ্গীকে। হয়তো তফাতে সরিয়ে দিতে চাইছে বিগত দিনগুলিকে, নতুনত্বের স্বাদে বিভোর হয়ে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে একে অপরকে কামনা করে পরজন্মে বিশ্বাসী স্বামী-স্ত্রী। ওরাও চাইবে। শুভেন্দুর যে স্থানটুকু ছিল বর্ণালীর মনোরাজ্যে, মলয় তা অচিরেই নিয়ে নেবে না তো কেড়ে।

কথা বলতে আরম্ভ করলে শুভেন্দুও থামে নি সহসা। কথায় কথায় বলে ফেলেছে বহু গোপন বৃত্তান্তও। অবশ্য যে-টুকু একজন কুমারী মেয়ের কাছে বলা সম্ভব, সেটুকুই বলেছে, নতুবা জানা যেত না শুভেন্দু বিবাহিত, বাপন তার সন্তান, লিপিকা সান্যাল নামে কেউ পতিত্বে বরণ করেছিল তাকে। আলাপ তাদের চুঁচুড়া লঞ্চঘাটে। চুঁচুড়া থেকে নৈহাটি যাতায়াতের পথে। লিপিকা তখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছাত্রী। শুভেন্দু সরকারি চাকরে। কাছেপিঠেই অফিস। কর্মসূত্রে এবং এমনিতে ও বিভিন্ন দিকে ঘোরাঘুরি করত। ঝোঁক ছিল খেলাধুলোয়-নাট্যচর্চায়। চেহারাটা আহামরি না হলেও ডাম্বেল-বারবেল লড়ে গতরখানি করে তুলেছিল লৌহদৃঢ় মজবুত। শুভেন্দুর তুলনায় হালকা-পলকা হলেও লিপিকা কুৎসিত-কুরূপা ছিল না। সরলতা মাখানো হাসিভরা মুখ, বিনম্র-অমায়িক ব্যবহার।

লিপিকা দূর-দূরান্তে পাড়ি জমাল শুভেন্দুর উপর নির্ভর করে। ক্ষেত-খামার নদী-খাল পেরিয়ে ভাঙাচোরা বাড়ি, মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়ে ছায়া-ঘেরা বন-বীথিকার মাঝে। গেল কল্যাণী ঘোষ-পাড়ায়। চাঁদমারী কুলিয়াপাটে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে, নবদ্বীপ-ধামে, শান্তিপুরে। একটা না-একটা উৎসব মেলায়। যথা-তথা বেরিয়ে পড়ত নতুন কিছু দেখার আগ্রহে। বন-নদ-নদী, খালে-বিলে-ঘেরা গ্রাম পেরিয়ে মাঠ-প্রান্তরে যেত মিলিয়ে। বিশাল-পরিব্যাপ্ত হয়ে মাথায় রোদ ছড়াত সূর্য। নামত বর্ষা, বর্ষার পর রোদ উঠত ঝলমলিয়ে। কখনও নেমে আসত সন্ধ্যা। হত শুক্লপক্ষের চন্দ্রোদয়। চাঁদের স্নিগ্ধকিরণ গায়ে মাখতে মাখতে হেঁটে বেড়াত জমির আল বেয়ে। সোনায় ভরা ধান গাছ। ধান গাছের একটা শিষ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত আর একটা শিষের গায়ে। দোল খেত মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে, উল্লাসভরে গা এলিয়ে দিত যেন কত আদর সোহাগে। মেঘ-কুয়াশা এসে মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্তার করত তার অধিকার। ঢেকে ফেলত অমিয় চন্দ্রকিরণকে। এক একটা দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে নব

নব দৃশ্য-ছবি ধরা দিত দৃষ্টি সীমায়। লিপিকা বসে পড়ত ঘাস জমিতে। কখনও সে গান গাইত, কখনও বা আবৃত্তি করত; শুভেন্দুও হত সামিল।

কাজলটানা চোখ, সরু চিবুক, পাকা ধানের শিষের মতোই গায়ের জেল্লা লিপিকার। শুভেন্দু নজর ফেরাতে পারত না ওকে দেখে, এক ঝলক আলো পেত সে সামনে। আশার আলো দেখা দিত মেঘ-কুয়াশা ভেদ করে। আলো-বাতাস-ছায়া-তরু দেয় প্রকৃতি, খাদ্য পানীয়-রসদ যোগায় শুভেন্দু। কাগজ পেন্সিল বের করে ছবি-স্কেচ আঁকে লিপিকা। শুভেন্দুর মাথায় থাকে ঘর-বাড়ির নকশা। আঁকিবুকি কাটে সে লেখায়-রেখায়। স্বপ্নজালও বোনে। লিপিকার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়। বিয়ের প্রস্তাব তোলে। লিপিকা সায় দিতে চায় না সে প্রস্তাবে। বলে—'স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে, পথ চলতে চলতে কতই তো সঙ্গী-সাথী জোটে, তাই বলে বিয়ে করতে হবে! বিয়ে-থার কথা আমি ভাবছিই না। গ্রাজুয়েশানের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চাই আমি।' শুভেন্দু বলত—'সে তো ভাল কথা, মানুষের কত কী করবার থাকে, করেও। কিন্তু আজ হবে, কাল হবে, ভবিষ্যতে হবে ভেবে কাজ ফেলে রাখলে সফলতা আসে না। যত কর্মশক্তি তেলশূন্য দীপ শিখার মতো ক্ষণে জ্বলে উঠে ক্ষণেই নিভে যায়। আসে বার্ধক্য, আসে জরা কালের অমোঘ নিয়মে। শেষ দিনটির কাছাকাছি পৌঁছে ভেবে-চিন্তে কোনও লাভ হয় না। সারা জীবন এমন করে কাটে না, কাটবেও না। প্রতিটি লোকেরই একটা সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। ঘর-গৃহস্থালী তোমাকে তো পাততেই হবে কাউকে নিয়ে। কথা দাও লিপিকা—'

লিপিকা থাকে গম্ভীর-নিরুত্তর। শুভেন্দুও জোর খাটায় না। লিপিকাকে সে সময় দেয়।

*

*　　　　*

স্কুল শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে যায় লিপিকা নদীয়ার মফস্বল গাঁয়ে। একলাটি থাকতে থাকতে মুখোমুখি হয় নানাবিধ সমস্যার। সমস্যা প্রধানত পুরুষ-মরদ সংক্রান্ত, যারা মনুষ্যত্বহীন অসভ্য হলেও সভ্য শিক্ষিত বলে নিজেদের জাহির করতে চায়। ধারে-কাছেই দেখে সে তাদের। মিশতে চায়, ধারে-কাছেও পেতে চায়। ছোঁক ছোঁক করে পশু জানোয়ারের মতো, সে যেন হরির লুটের বাতাসা, লুটেপুটে খাবে। বাবা-কাকা দাদা ভাইয়েরা মেয়ে-দিদি-বোনকে কামনার ভোগ্যবস্তু করে নেবে। কে যে নয় লালায়িত গায়ে গা ঠেকাতে! উঁকি মারে পাশবিক প্রবৃত্তিটা স্নেহ-প্রীতি-করুণা প্রকাশের অন্তরালে। রমণীর রমণীয় ত্বক দিয়ে মোড়া রক্ত-মাংস-চর্বির দেহ অপেক্ষা অন্য কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই বুঝি? বই-পুঁথি-পড়া মুখস্থ বিদ্যেটুকু পুঁজি। পারে নি সভ্য-ভব্য হতে। শেখে নি যোগ্য সম্মান দিতে।

অন্যায়-অবিচারকে প্রশয় না দিয়ে মানুষকে যারা সম্মান দেখাতে জানে, শুভেন্দু তাদেরই দলে। যখন সে লিপিকার সঙ্গে বেড়িয়েছে পথে-প্রান্তরে তখন তাদের দেখে কেউ অশালীন মন্তব্য করেছে তো প্রতিবাদ জানিয়েছে শুভেন্দু। জুগিয়েছে সাহস-বল। একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ববান পুরুষ মনে হয়েছে ওকে। নিজের সুবিধা না দেখে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছে লিপিকার দিকেই। সেই মানুষটাকে উপেক্ষাই বা করে কেমন করে! অভাব দেখা দেয় একটা নিরাপত্তা বেষ্টনীরও।

অবশেষে লিপিকা সায় দেয় শুভেন্দুর প্রস্তাবে। কম নুন খায় নি। নুনের মূল্য শোধ-বোধ না করলে হয় যে নিমকহারামি। একটি শর্ত আরোপ করে লিপিকা—'একটা স্বাধীন সত্তা থাকে যেন আমার। সন্তানাদিও আপাতত নয়।'

শুভেন্দু ঘাড় নাড়ে। বলে—'বেশ তো। গর্ভ ধরবে কি ধরবে না, সে সিদ্ধান্ত নেবার মালিক হবে তুমি।'

এতটা ক'জনেই বা মানতে চায়? ওরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে। বিধবা সৎমা ও দূর সম্পর্কের কেউ কেউ এতে বাগড়া দিলেও বাধা দেয় না কেউ ওদের গতিপথকে। মনে মনে ওদের মিল খায়। একীভূত বোধ করে মন্দির-মসজিদ-গির্জাকে। মেনে নেয় একটি ধর্মকেই, যার নাম প্রেমধর্ম। তবে প্রেম-ধর্মের দোহাই পেড়ে কে ক'দিন থাকতে পারে? দেহকে বাদ দিয়ে যে-প্রেম সে-প্রেম তো রক্ত-মাংসের মানুষের প্রেম নয়। মশলা বিনে মাংস—মাখন তোলা দুধ—মিষ্টি বিনে চাটনি ক'দিন কার রোচে?

'পোকা'-টা খুঁচিয়ে মারে। চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-স্বামীজীর ধ্যান করে রাতটাকে পুইয়ে দিতে পারে না শুভেন্দু। পারে না সে আকাশের তারা-নক্ষত্র গুনতে গুনতে দেহ-মনকে বাঁধতে। বউ করে কোনও সুন্দরীকে নিয়ে আসা সংযমী ব্রহ্মচারী হবার জন্যে তো নয়। ভোগের পরেই ত্যাগের প্রশ্ন। লিপিকার শর্ত-বিশ্বাস-হিতোপদেশকে দিতে চায় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। উদ্দাম-উত্তাল হয়ে ওঠে। রক্তে-রক্তে, শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে এক প্রলয়নাচন লিপিকাকে দেখলে। ওকে সামনে-কাছে-পাশে পেলেই খুলে যায় সংযমের বাঁধ। এভাবে যে দেহের অবুঝপনা, মনের পরিবর্তন হবে কে তা জানত! দুর্বার যৌবনের তীব্র-তীক্ষ্ণ কামনা বাসনা উন্মাদ করে তোলে শুভেন্দুকে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে একই চিন্তাভাবনা। ঝরে যাবে এ রূপ-তেজ-যৌবন, আসবে জরা, আসবে মৃত্যু। যত যা কাজ-কাম-ক্রিয়া চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলতে হবে রথ-বলটুকু থাকতে থাকতেই। ফুর্তি করেই কাটানো যাক না যে-কটা দিন আয়ু আছে।

লিপিকার ভোগ-দখল পেতে না-পেতে শুভেন্দু আলাদা এক মানুষ হয়ে ওঠে। অতীতের চরিত্র-আদর্শ-ব্যক্তিত্বকে দেয় জলাঞ্জলি। পারে না কথা রাখতে, বলে-কয়ে পথে আনতে চায় লিপিকাকে।

যা চাওয়া স্থায়ত বৈধ তা-ই সে চায়, পায় না চাহিদা অনুসারে। কে জানত লিপিকা যে এতটা অনাগ্রহী কামাচার সম্পর্কে। সমর্পণ করে কখনও-সখনও অনিচ্ছায়, বিরক্ত হয়ে। অনড়-নাছোড় শুভেন্দুকে দেখে দেখে বিতৃষ্ণা বীতরাগ জাগে। অসাড় হিম হয়ে কুঁকড়ে গুটিয়ে থাকে, নিশিরাত্র কাটায় একলা আলাদা ঘরে। ভিতর থেকে আটকে দেয় দরজার ছিটকিনি। এদিকে নেশাটা এলে-বেলে করে দেয় শুভেন্দুকে। দুর্বার কামনা বিহ্বলতায় অস্থির হতে হতে সে বিনিদ্র রজনী কাটায়।

কার্যক্ষেত্রে সব সময় সব কথা খাটে না। 'সন্তানাদি আপাতত নয়' কথাটা মিথ্যা হয়ে গেল। লিপিকা গর্ভধারণ করল। বাপন ভূমিষ্ঠ হল অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে। হুঁশিয়ারি দিলেন ডাক্তার। 'সেকেণ্ড বেবি এলে মায়ের জীবন বিপন্ন হতে পারে, সুতরাং বুঝেসুজে চল মা।'

লিপিকাও চায়, যেটি এসেছে সেই বেঁচে-বর্তে থাকুক। নিরোধ-প্রতিরোধে সে উৎসাহী নয়। উৎসাহী নয় শুভেন্দুর তালে তাল দিয়ে খ্যাপামো বাড়াতে, আগুনের তাপে ঘি হয়ে গলতে। লিপিকা জানিয়েও দেয়—'বাপনকে পেয়েছ, ওকে ঠিকমতো গড়ে তোল। সামান্য সুখটুকু ভুলে থাক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।'

কে শোনে কার কথা। পেয়েও না-পাওয়াটা মরিয়া করে তোলে শুভেন্দুকে, লাগে সংঘাত-দ্বন্দ্ব। নির্যাতন চালায়, ভুলে যায় পবিত্র মেলামেশার কথা, প্রেম নিবেদনের কথা। চোট-ধাক্কা খেতে খেতে লিপিকা দাঁড়ায় সোজা হয়ে। সমাজে যার পরিচয় শিক্ষাদাত্রী জননীর, মানুষ গড়ার সাধনা যার, কেন সে লালসা-আগুনে ঝলসে দেবে নিজেকে, সইবে স্বামীর অত্যাচার? এখন আর সে ভীতু বালিকাটি নেই, ঢিল এলে পাটকেলটি ফেরত দিতে জেনে গেছে। হার মানে সেই সুখের ঘরকন্নায়। অপমানিত হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকতে চায় না। চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মসংযম সম্বল করে ঘর-বর-সন্তান ছেড়ে কর্মস্থলে চলে আসে। জোরালো কণ্ঠেই জানিয়ে আসে শুভেন্দুকে—'স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যে চলে সে স্বামী নয়, অন্যায়

নির্যাতনকারী। আরও মনে রেখ, মেয়েমানুষ শুধু শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্যে জন্মায় নি; তার দেহ-মন আরও কিছু চায়। জীবনটাকে আমি সঁপে দিতে চাই শত শত শিশুকে গড়ে তোলবার পেছনে।'

বাপনকে রেখেই আসে লিপিকা। শুভেন্দুই দেয় না, জোর খাটায় না লিপিকাও, পিছনপানে না-তাকিয়ে সামনের দিকেই সে এগিয়ে যায়। এই বলে বুঝ দেয় মনকে, সবার জন্য সব নয়।

*

* *

একটা মানুষের অভাব-অনুপস্থিতি বড় বাজে বুকটায়, ক্রমান্বয়ে টের পেতে থাকে পেয়ে হারাবার জ্বালা।

অফিস কামাই করে বাড়িতে থাকে শুভেন্দু। চেয়ারটা টেনে এনে বসে জানলার ধারে।

গাছভরা ফল, মাঠভরা ধান। চোখ ভুলানো প্রকৃতি কবেই হারিয়ে গেছে। হাল আমলে রয়েছে শুধু আগাছা-জঙ্গলে ভরা গাছ কয়টা। বড়সড় হয়ে উঠেছে চারাগাছগুলি, কতবার ছেঁটে-কেটে দেওয়া হয়েছে নিমের ডালটা, আবার বেরিয়েছে ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা। কম ভালবাসত না গাছ-গাছালিকে, কত সময়ই কাটাত শুভেন্দু ফল-ফুলের বাগিচা-বাগান নিয়ে। বকফুল গাছটায় কত ফুল ফুটত। লিপিকা বড়া ভাজত বকফুলের। খোঁপাতে গুঁজত বেল-গন্ধরাজ, মালা গেঁথে পরাত ঠাকুর-দেবতার ছবিতে। ফুল রাখত ফুল-দানিতে, ফুলে ফুলে গুঞ্জন তুলত ভ্রমর মৌমাছি, উড়ে এসে বসত শালিক-টিয়া-চন্দনা-কোকিল, বউ কথা কও, জোড়া জোড়া ঘুঘু পায়রা। গাছে গাছে ফল আম-কাঁঠাল-পেঁপে-কলা-আনারস-জাম-জামরুল। ছিল বাতাপি-গন্ধরাজ-গোঁড়া-কাগজি-পাতিলেবু।

কত কী মনে পড়ে। শুভেন্দু ফিরে যায় তার কৈশোরকালে। সঙ্গে বাপন। জানায়—ফাঁদ পেতে কত যে ঘুঘু ধরেছি, কাক ধরেছি।

বাপন বলে—'আমিও তাত ধলব বাবা।'

—'অমন কাজও কর না। ঘরে টেঁকা দায় হবে।'

—'তেনো বাবা?'

—'কাকের পা ফাঁদে আটকেছে কি চিৎকার করে ডাকতে থাকবে, সেবার যেমন হয়েছিল। কাকেদের নিজের জন, চেনা-জানা, খেলাধুলো করার, উড়ে-ছুটে বেড়াবার সাথীরা, সব্বাই এসে জুটে গেল ঘর-বারান্দায়। তাদের সে কী ডাকাডাকি! কা-কা-খা-খা। আমার মা বললেন --ছেড়ে দেরে, ওকে ছেড়ে দে। কাকটাকে উড়িয়ে দেব বলে কাছে এগোতেই দিল কামড়ে ঠুকরে। সবাই মিলে চাপল আমার ঘাড়ে-কাঁধে-মাথায়।'

—'তাত তোমালে তামলাল লক্ত বেললো না?'

—'অল্প একটুকুন কামড়াল, তাই রক্ত বেরল না। ছেড়ে দিতেই কাকটা অন্যদের কাছে গেল ছুটে। কী যেন বলল। কাকেদের নিয়ে আমি ভোঁ কাটলাম। ওরা নড়তে চাইল না, কলার পাতায় করে মা ওদের এনে দিলেন ভাত-মাছ-ডাল। একবালতি জলও দিলেন এনে। মনের সুখে নেমন্তন্ন খেয়ে 'আবার দেখা হবে' বলে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে চলে গেল।'

—'তোমলা তি খেলে?'

—'যা ছিল খেলাম, আমাদের খাবার মা আগে তুলে রেখে-দিয়েছিলেন যে।'

—'অ্যাতো চালাত থাকুলমা, তালপল আলও বল বাবা।'

—'বলছি বাবা বলছি, ভয় পেয়ো না যেন। এখান থেকে আর একটু এগোলেই একটা বাঁশঝাড় ছিল। একটা ময়াল সাপ এসে ঠাঁই নিল সেখানে। আস্ত খরগোশটাকে ধরে খপাৎ করে গিলে ফেলল আমার চোখের সামনে, পড়ে থাকল পেটটাকে ঢাক করে। কাছে

যেতেই মাথা তুলে হিস্‌হিস্‌ করতে থাকল। বিপদ বুঝে ডেকে আনলাম মাকে-বাবাকে, পাড়ার লোকেদের।'

—'ওলে বাবা, ভয় তরছে।'—বাপন চোখ বড় বড় করে শুভেন্দুকে জড়িয়ে ধরে।

—'বাপন, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। এদিকে ওদিকে তাকাতে হবে না। সাপটাকে ধরে বাক্সবন্দি করে দিয়ে আসা হল চিড়িয়াখানায়।'

—'তোমলা তেমন তরে ধললে ছাপ?'

—'ফাঁস আটকে। বেতের ঠুলি মাথায় পরিয়ে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব আমাদের বাঁশ-বাগানের ময়াল সাপটাকে।'

—'আবাল বল বাবা।'

—'আমাকে ছেড়ে দাও বাপন। ভয় কিসের। এবার যেটা বলব ভয় পাবার কিছু নেই। ময়াল সাপটা চলে যাবার দিন কয়েক বাদে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আকাশ ছেয়ে আছে কালো কালো মেঘে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। দেখতে দেখতে অঝোরে বৃষ্টি নামল, মাঠ-ঘাট সব ডুবে গেল জলে। লাফাতে-লাফাতে, সাঁতরাতে-সাঁতরাতে উঠোনে চলে এল ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ। এত-এত কই-শিঙি-ল্যাঠা উঠে এল বারান্দায়। সবাই মিলে মাছ ধরলাম। খেলামও ঝোল-ঝাল করে। মায়ের হাতের রান্না খেতে কী যে সুস্বাদু।'

—'তাতেলা খেলনা বাবা?'

—'ওরা কত খাবে! খিদেই পেতনা ওদের। আমরা মাছ ধরতাম বারান্দায় বসে। ওরা কাদা-জলে নেমে খুঁজে নিত আহার। টপাটপ কামড়ে-হিঁচড়ে খেয়ে নিত। সেদিন নেমন্তন্ন খাওয়াতেই কাকেদের সঙ্গে এত ভাব হয়ে গিয়েছিল আর কামড়াত না।'

—'হনুমানেলা তোথায় দেল?'

—'হনুমান এখন দেখতে পাবে না। আছে কোন বটগাছের ডালে। কলা খেতে পায় না, কলাগাছ তো নেই, তাই এদিকে কম

আসে। এক মা হনুমান প্রায়ই আসত। তাকে কলা দিতাম, আম দিতাম, আমাকে দেখতে পেলেই ছেলে-মেয়েকে কোলে-পিঠে নিয়ে চিঁ-চিঁ করে ছুটে আসত। আম কুড়োতাম গাছের তলায়। গাছ থেকেও নিতাম পেড়ে। কোনও আমটা লাল টুকটুকে, কোনওটা বা গোলাপি রঙের। কোনওটা বাইরে থেকে দেখতে কাঁচা, ভেতরটা পাকা, তাকে আমরা বলতাম বর্ণচোরা আম।'

—'বলনোচোলা আম তোথায়?'

—'বর্ণচোরা আমের সে গাছটা নেই। ওই গাছে এসে বসত হনুমান, এখন বসবার জায়গা সে রকম না থাকলেও সময় সময় চলে আসে, লেজ তুলে হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। হনুমান এলেই তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। তুমি খেতে দেবে। কত আম আনব, আপেল আনব, আঙুর আনব, তুমি খাবে বসে বসে। হনুমানকেও দেবে।'

—'তুমিও তাবা বাবা। এতনই হনুমান যদি আসে তি খেতে দেব বাবা? তিছুই তো নেই।'

—'তাই তো বাপন, মুশকিলেরই কথা। চল বাড়ি যাই। অফিসে যেতে হবে তো আমাকে। খাবার-দাবারও অনেক আনতে হবে।'

বাপনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখতে হয়। ওর সঙ্গে বকবক করে কাটে শুভেন্দুর ছুটির দিনগুলি। অফিস থাকলে বেশির ভাগ সময় বাপন থাকে শুক্লাদির বাড়িতে। পাশের বাড়ির চিরকুমারী শুক্লা ভৌমিক পুজো পাঠ নিয়ে থাকেন। ভাইঝিদের লেখা-পড়া করান, স্কুলে নিয়ে যান, বাপনও যায় সঙ্গে।

*

*　　　　*

লিপিকা চলে যাবার পর ঘুচতেই চায় না শুভেন্দুর মন-মরা ভাবটা। হতাশা মনকে নাড়া দেয়। সকল শূন্যতাকে লিপিকাই রেখেছিল

পূর্ণ করে, ও চলে যেতে সে কথাটা মাথায় আসে শুভেন্দুর। এক হাতে কম করে নি, ঘর-সংসারে এসেছিল দরদ-ভরা ভালবাসা নিয়েই। চাকরি বজায় রাখবে, স্বামী-সন্তান-সংসার দেখবে, এই তো সে চেয়েছিল। একটা ব্যাপারেই যা ওজর-আপত্তি। দোষ তার নয়। মেয়েদের দোষ থাকে কমই। একটুখানি ঘুম-নিদ্রা, সহানুভূতির প্রলেপ-সুখ প্রত্যাশায় ওঠে গিয়ে স্বামীর খাট-বিছানায়। স্ত্রীকে স্বামী ভোগ্যবস্তু বানিয়ে রগড়ে রগড়ে রস-কসহীন করে ফেলতে চায়। এর ভিতর প্রেম-প্রীতি থাকে কতটুকু? সে-ও তো টান-ভালবাসার নামে টানাটানি কম করে নি লিপিকার অঙ্গটাকে। অশান্তি বিবাদ তো তাই নিয়ে।

সুরে-সুরে গানে-গানে পলাশ যে কথাগুলো বলে তা অর্থবহ। অনেক সময় ওর গাওয়া গান গুনগুনিয়ে গায় শুভেন্দু। 'তুমি রূপ দেখে ভালবেসো না, রূপের মোহ বড় বিষময়, ভালবেসে সুখ পাবে না—' এ যেন এক মন্ত্র, যা গ্রহণ করতে পারলে রেহাই হয়তো বা মিলত রূপ আগুনের জ্বলুনি থেকে।

দিনে দিনে শুভেন্দুর কাছে সবই ঠেকে বেনিয়ম-বেসুরো। শরতের শিউলি, বসন্তের বাতাস, পাখির কূজন সে-ভাবে নাড়া দেয় না মনকে। নিরাশা-অবসাদে একমাত্র আশা জাগিয়ে রাখে বাপন। ও-তো লিপিকারই দান। ঘুরে-ফিরে নেয় সে বাপনকে কোলে তুলে। ভুলে থাকার চেষ্টা করে পেয়ে হারাবার ব্যথা জ্বালা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

এই পরিস্থিতিতে, বর্ণালী এল কাছাকাছি, ছুটো মনের কথা বলা-কওয়ার লোক পেল শুভেন্দু। আর চাইল না সে ভুল পথে যেতে, কারও রূপের মোহে হুমড়ি খেতে, খেলার পুতুল বানাতে কাউকে। যাকে পাবে না, ভাবে না সে তাকে। ভাবে বাপনকে, ছেলে-মেয়ের মা বাপনের মা হিসাবে কল্পনা করে সে আপামর মেয়েদের। দমন করে অদম্য রিপুটাকে। একজনকে পেয়েও না-পাওয়া, একটা অতৃপ্তির বেদনা অন্তরে বাজলেও নিজের চাহিদা সম্পর্কে থাকে নিস্পৃহ।

প্রীতি-সহানুভূতির প্রতিদানে কিছুই চাওয়া-টাওয়া নয়। ভালবাসবে নিঃস্বার্থভাবে। পাশে যে এসেছে, চাইবে তার কাছে স্নেহ-সহানুভূতিটুকু, কোন কিছু নেবে না, উলটে দেবে। বিয়ে-থা দিয়ে দেবে বর্ণালীকে। আইবুড়ো ছোটবোন বা মেয়ে থাকলে লোকে যা করে তাই সে করবে, খারাপ হতে দেবে না বর্ণালীকে। ওকে কেউ খারাপ করতে চাইলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধও করবে, যেমনটি করেছিল দিব্যেন্দুর বেলায়।

এক টেবিল থেকে অন্য টেবিল। এক ঘর থেকে আর এক ঘর। কতটাই বা ব্যবধান। মনে মনে মিল খেলে বিলম্ব হয় না এই ব্যবধানটুকু ঘুচতে। এরকম তো আকছারই হয়ে আসছে, কিন্তু ভবি ভোলবার নয় আর।

আলাপ পরিচয়ের পর বর্ণালীদের বাড়িতে গিয়েছিল শুভেন্দু। বর্ণালীর মা ওর খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর, যত্ন-আত্তি-আদরও করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে 'জামাই আদর'। রান্না-বান্নাই হয়েছিল সাত-আট ভাগে। শুভেন্দুর সঙ্গে বর্ণালীও বসেছিল খেতে। খুঁটে খুঁটে খেয়ে শুভেন্দু উঠে পড়তেই ওর পাত কুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল। এক জায়গায় বসে গল্পগুজব, একত্রে বেড়ানো। এসব লক্ষ্য করে কেউ কেউ অনুমান করেছিল শুভেন্দুই হবে সে বাড়ির ভাবী জামাতা। ভবনাথেরও ছিল সে মনোবাসনা, ভারতীরও অমত ছিল না। আর বর্ণালীর তো ছিল ষোলআনা সায়। একসময় শুভেন্দুকে ঘিরে ছিল তার মনে মোহময় স্বপ্নের আনাগোনা। বলেছিল, 'আমায় নিয়ে সংসার পাত তুমি।'—নাকচ করেছিল শুভেন্দু, জানিয়েছিল, 'একজনকে তোমার অন্যায় সঙ্গ-সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে আমি ঘর বাঁধব বলে যে তোমার সঙ্গে চলাফেরা করছি, এতই হীন পশু নই আমি। আমি তো বলেছিও, এ ন্যাড়া ব্যর বার বেলতলায় যাবে না। একবারেই সাধ মিটে গেছে।'

বর্ণালী বলেছিল, 'মিথ্যে দিয়ে জলজ্যান্ত মিথ্যেটাকে ঢেকো না শুভেন্দু। তুমি কি বলতে চাও তোমার সব সাধ মিটিয়ে লিপিকা চলে

গিয়েছিল? আমাকে লুকিয়ে লাভ নেই, তোমার মুখ আমাকে বলে দেয় তোমার মনের কথা। তুমি যাকে চেয়েছিলে তাকে পাও নি। পার নি ভালবাসতেও।'

—'অবশ্যই তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। তবে ভালবাসারও রকমফের আছে, অপ্রিয় হলেও সত্যি কথাই বলছি, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই ভালবাসাটা ছিল, 'মুসলমানের মুরগি-পোষা'। লিপিকা আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেছে। আলাদা এক মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে।'

– 'বুঝছি না, কী মানুষটা তুমি হয়ে উঠতে পেরেছ! মেয়ে-মানুষে তোমার যে অরুচি দেখা দেয় নি এখনও, সে কথা হলপ করে বলতে পারি। মেয়ে আর মুরগিতে তুলনা চলে না শুভেন্দু। বুঝেও অনেক কিছু তুমি বুঝতে চাও না। তুমি জ্ঞানপাপী। মেয়ে-বউদের ভালবেসে কবজা করে রাখতে হয়। মেয়ে-ভাগ্যটি বরাবরই তোমার ছিল, থাকলে কি হবে। তাকে তুমি কাজে লাগাতে পারনি। উঠতি বয়সে কার পাল্লায় না পড়েছিলে? মহিষী না কী যেন নামটা?'

—'ওঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না। ধান শুনতে কান শোন। তুমি শুক্লাদির বোন মনীষার কথা বলছ। মিষ্টি গলায় চমৎকার গান গাইত মনীষা। অথচ মেয়েটি দৈবাৎ গলা সেধেছে কি সাধে নি। রেডিয়োতে শুনে শুনে সুর নকল করেই সে গাইত। আমাকে বলেছিল, 'একটা হারমোনিয়াম কিনে আনুন, দুজনে গলা সাধব।' ওকে আমি তা দিয়েছিলামও। তবে গলা সাধা আমার হয় নি সময়াভাবে।'

—'সময়ের অভাব, না লজ্জা পেতে? লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়। যাই বল, 'পহেলি প্রেম' ব্যর্থ হতে দিয়ে তুমি লিপিকার অধিষ্ঠান ঘটিয়েছিলে।'

—'মনীষা আসত কাজে-অকাজে। আমার সুবিধে-অসুবিধে দেখত। ময়লা জামা-প্যান্ট কেচে দিত। আবার বলত, প্যান্ট-শার্ট না পরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরলে আপনাকে দারুণ মানাবে।'

—'মানানো-অমানানো, সুবিধে-অসুবিধে কেউ শুধু শুধু তো দেখে না। যাই বল, মনীষাও তোমাকে চেয়েছিল।'

শুভেন্দু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনীষা-লিপিকা-বর্ণালী তিনজনের কথাই জড় হয় মাথাটায়।

মনীষা কোনও একদিন পথের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল বাপনের হাত ধরে। যাত্রী-বিক্ষোভের ফলে ট্রেন লেট থাকায় সাড়ে সাতটার ট্রেন দশটায় এসেছিল। এদিকে বৃষ্টিবাদলা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আলোর চমকানি, কড়াৎ কড়াৎ মেঘ গর্জন। ঝড় ছাড়ল শোঁ-শোঁ শব্দে অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টির সঙ্গে। বারান্দায় উঠতেই প্রশ্ন — 'আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'তোমার খুব ভয় করছিল, না? শ্মশানের ওখানে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

শুভেন্দুর কথা শুনে মনীষা বলে উঠেছিল—'কী দুঃসাহসী ছেলে গো আপনি। জানেন কি কতবার বাজ পড়েছে ওই গাছের মাথায়? কত লোক, গরু-ছাগল মারা গেছে? যাক বাঁচা গেল!'

এই হল মনীষা। আপন জনের মতো ব্যবহার, কথাবার্তা। মনীষা ছিল বোন-ভগ্নী, বর্ণালী ছিল সহচরী বান্ধবী। স্ত্রী ও কামনার জন হিসাবে চেয়েছিল সে লিপিকাকেই। অন্য কাউকে নয়। বিয়ের পর ওকে দেখলে পারত না সুস্থির থাকতে। থেকে থেকে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত প্রবৃত্তিটা। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফেরার পর অসহ্য লাগত লিপিকার। স্মরণ করিয়ে দিত সে তার শর্তের কথা—'বলেই তো ছিলাম একটা স্বাধীন সত্তা থাকে যেন আমার, বাচ্চা-কাচ্চাও জলদি জলদি নয়।'

শান্তির সংসারে অশান্তির আগুনটা জ্বলে ওঠে শুভেন্দুর এক-গুঁয়েমিপনা থেকেই। কী বিচিত্র মানুষের মন। লিপিকা তার সংসারে বউ হয়ে আসবার আগে-পরে যে মেয়েদের দেখেছে শুভেন্দু, নেহাতই তাদের মেয়ের মতো দেখেছে। মনে কোনও ভাবান্তর হয় নি, দেহ-মনে আগ লাগে নি।

*

*　　*

দিনকয়েক বাড়িতে থাকে শুভেন্দু, ঘর-দোর চুনকাম করায়। লোকজন লাগিয়ে পয়-পরিষ্কার করিয়ে নেয় বাগান-জঙ্গল। কত চারা-বীজ এনে পুঁতেছিল ঘরের পিছন দিকে। লাউ-কুমড়ো-ঢেঁড়স-বেগুন-লঙ্কাগাছ হয়েছিল। তার অনেকগুলো হয়ে যায় শুকিয়ে দড়ি দড়ি। দেখে খারাপ লাগে। শুধু কি তরিতরকারি ক্ষেতই শেষ হল? ফুল-ফলের গাছও মর-মর। বাহারি লতাগাছের সে জৌলুস চাকচিক্য নেই। সাজানো বাগান শুকিয়ে এসেছে। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। সেখানেই ছিল তার ঔদাসীন্য।

শুভেন্দু ঘর-বাগিচা সাফসুতরো করিয়ে যেদিন অফিসে এল, ভবনাথের মুখে শুনল বর্ণালী আনন্দপুরে রয়েছে। থাকবে কয়েকটা দিন। শুভেন্দুর ইচ্ছা করছিল দেখা-সাক্ষাৎ করে আসতে। যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে তো বর্ণালী? মনের মানুষকে পেয়ে মেয়েরা তো সামান্য দিনেই ভুলে যায় ফেলে-আসা দিনগুলো। দোনোমনো করে ওর যাওয়া হল না। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বাপন আজকাল চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। বাবা কখন ফিরবে কলকাতা থেকে একটা না একটা খাবার নিয়ে। আনবে ফল, আনবে ছানা-মিষ্টি-গজা-সন্দেশ। বর্ণালীর বিয়ের পরদিন অফিস থেকে বাড়ি পৌঁছে শুভেন্দু দেখে বাপন অস্থিরপনা করছে। বাবার খোঁজে অফিসে যাবে। স্কুলে যাবে না। সকালে পড়তেও বসে নি। মনীষা নাকাল হচ্ছে ওকে সামলাতে। কোন্ পাষণ্ডের মন চায় ওকে আড়ালে রেখে কিছু করতে?

এরপর থেকে শুভেন্দু একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। সেদিন কী ভেবে সে জল-বায়ু-কাননে একটা চক্কর দিয়ে আসে। লিপিকা চলে

যাবার পর এই বাগানের নেশাটা তাকে পেয়ে বসে, আর কিছু নয়। এখানে বসে থেকে যে-কোনও বিষয় নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবতে পারে, একান্তে বসে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে।

গঙ্গার জলে তখন রোদের ঝিলিক। শুভেন্দু বসল এসে বাগানের একটা বেঞ্চিতে। বসে থেকে থেকে সূর্য ডুবল। বাতি জ্বলল দুটো-চারটে। আঁধার তাতে ঘুচল না।

কতদিন এখানে বসে বর্ণালী সুর ভাঁজত। কখনও বা গলা ছেড়ে গান গাইত। সে-ও তার সুরে সুর মেলাত, এদিকে ওদিকে মিলে যেত মানুষের মেলা। আসত যুবক-যুবতী, নর ও নারী। বসে পড়ত দূর্বাবনে, গাছ-গাছালির তলায়। এক একদিন দৃষ্টিকটুই লাগত কোনও কোনও দৃশ্য। লজ্জা-জড়তা-ভয়-ভাবনা নেই। নেই শুচি-অশুচি বিচার। হয় তো বা দেখা যেত, কাগজ পেতে আধ-শোয়া হয়ে পড়ে আছে অগোছাল শাড়ি জড়ানো একটি দেহ। কোল জুড়ে কেউ শোয়া, ভাবটা যেন মা দুধ দিচ্ছে তার সন্তানকে। বাচ্চার মাথা মায়ের কনুইয়ের আড়ালে, শাড়ির অন্তরালে। এ জায়গায় এলে এমন দৃশ্য দৃষ্টি-সীমায় আসবেই আসবে। শুভেন্দু চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে সিধে হাওয়া কাটত। বর্ণালী সঙ্গে থাকলে আগেভাগেই নিত উচিত ব্যবস্থা।

পাঁচজনের মাঝে থেকে যা হবার নয়, হচ্ছে তা জল-বায়ু-কাননে। কত ধরনের সব ছেলে-মেয়ে। কে জানে ফুলের মতোই যাদের নিষ্পাপ থাকার কথা তারা কেন পারছে না থাকতে। বড়দের দেখে দেখেই কি এ-পথে পা ফেলেছে, ক্ষীণালোকে পাতালে নেমেছে? কী যেন দেখে শিস দেয়। টিপ্পনী কাটে বকাটে-বিকৃত-রুচিগ্রস্তরা। যা কিছু কুৎসিত-কদর্য তাই নিয়ে বিভোর তারা।। এখানে এসে সোয়াস্তি মেলে না, নাতি-নাতনী নিয়ে অনেক বৃদ্ধ আসেন খোলা-মেলাতে একটু সময় পায়চারি করতে। ইঁটের প্রাসাদ, পিচপাথরের রাস্তার গরম টেনে আনে তাঁদের খোলা-মেলা পার্ক-ময়দানে। এসে

পারেন না তিষ্ঠতে। প্রবেশের পর করেন প্রস্থান 'ঘোর কলি' 'ঘোর কলি' বলতে বলতে।

শুভেন্দুও শেষ বিদায় জানাতে চাইল সেই পার্ক-বাগানকে। আর সে আসবে না এখানে, দেখবে না নোংরামিপনা। বর্ণালীকে নিয়ে আসা অন্যায় হয়েছিল।

ওরা দুজনে যে দিকটায় বসত, গান আবৃত্তি করত—সেদিকে যেতেই একটা চেনামুখ এল এগিয়ে—'দিদিমণি দেখছি আসেন নি, আপনাকে দেব দাদা?'

প্যাটিস খাবার রুচি ছিল না। শুভেন্দু বলল—'জল পেলে খেতাম।'

ছেলেটা এক গ্লাস জল এনে দিল।

মুখচেনা কয়েকজনও তাকাতাকি করছিল, প্রশ্ন এল—'দাদা একলা কেন?'

কেউ অনুযোগ করল– 'কতদিন আসেন না বলুন তো!'

কেউ বা জানতে চাইল—'তেনাকে কোথায় রেখে এলেন?'

উপযুক্ত জবাবটা দিয়ে দিল শুভেন্দু—'আমার সঙ্গে যাকে দেখতেন সে রাস্তার মেয়ে নয়। বোন গিয়েছে স্বামীর ঘরে। বোনের জন্য দাদার যতটা করণীয় করেছি। প্রাণ ভরে বাতাস নিতে, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে আমরা এসে বসি, এখানে নষ্টামো ইতরামো দেখতে নয়। আজ অভ্যাসবশেই আমি এসেছিলাম।'

ডিপোতে ট্রাম ঢুকছিল। দৌড়ে গিয়ে ট্রামে চেপে বসল শুভেন্দু। ট্রামটা রাজাবাজার যাবে।

শুভেন্দুর মাথায় কত কী খেলে, এ কাননে আর আসবে না। বাড়িতেই গড়ে তুলবে ক্ষুদ্র একটি পার্ক। শিউলি-কদম-কাঠগোলাপ-হাসনুহানা গাছ কয়টাকে ঘিরে নেবে। মাঝখানের ডোবাটাকে নেবে কাটিয়ে, যাতে জল থাকে, মাছ থাকে, সকালে-বিকালে সেখানেই ঘুরে বেড়াবে বাপ-বেটা। বসবেও।

*   *

বিয়ের পর মেয়েদের ধ্যানজ্ঞান হয় স্বামী-সংসার। বর্ণালীও তাই পেয়েছে, পেয়েছে সুখ-স্বপ্নভরা একটি নিঝঞ্ঝাট আশ্রয়। বাক্যালাপ হল কি হল না, অজ্ঞাত-অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে রাত কাটাতে হল বাসর-শয্যায়। দ্বিধা-সঙ্কোচ আড়ষ্টতা ছিল। চোখের পাতা মেলে না রাখলেও ঘুম যাকে বলে তা ছিল না বর্ণালীর চোখে।

সকাল বেলায় যাবার জন্যে শুভেন্দু বেরতেই বুক ঠেলে কান্না পেল। ও তাকিয়ে রইল তার চলে-যাওয়া পথের দিকে। বিদায়-বেলা ওরও আসছিল ঘনিয়ে। মায়ের গর্ভ নাড়িছেদ ভিন্ন করে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। স্বামীর ঘরে যাবার সময় বহু বিস্তারিত সেই রকম মায়া-নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে ওকেও চলে যেতে হবে। ভাবতেই বুকটা উঠছিল দুমড়ে-মুচড়ে। এযাবৎ যেভাবে চলেছে-ফিরেছে, এবারে তা বদলাতে হবে। যে যত প্রিয়জনই থাকুক তাদের পিছনে সরিয়ে এগোতে হবে নতুন মানুষটার হাতে হাত মিলিয়ে, চেনা-জানা গণ্ডি ছাড়িয়ে। কজনে তা পারবে? কজনে পায় ভাল ঘর, ভাল বর? মোদ্দা কথাটা হল মানিয়ে নেওয়া। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই। মানিয়ে নেবার ব্যাপারে প্রশ্নই উঠত না যদি সে পারত শুভেন্দুকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে নিতে। সতীন তো ছিল না, ছিল বাপন। আদরের বাপন ও শুভেন্দুকে নিয়ে সুখেই কাটত তার। শুভেন্দু বুঝল না। দেখাল বিস্তর ওজর আপত্তি। বর্ণালী তাকে তো এমন বন্ধু-ভাই বলে চায় নি। চেয়েছিল একান্তই আপন মানুষ করে নিতে।

মেয়েদের সব সেরা যে আশ্রয় সেখানেই এল বর্ণালী। বাদবাকি জীবনটা তার পতি দেবতা ও নিকটাত্মীয়দের নিয়ে কাটাবার কথা। আত্মীয় বলতে সে রকম কেউ নেই। মা-বাবা গত হয়েছেন বহুদিন।

বাড়িতে দেবা-দেবী এবং ঝি ডলির মা। সে রাঁধে-বাড়ে, বাসন মাজে। যখনকার যা কাজ করে দিয়ে চলে যায় নিজের ডেরায়।

গায়ে গায়ে বাড়ি-ঘর। অবাধে যাতায়াত করা চলে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি। পাড়া-পড়শিরা এসে কত কী কানাকানি করছিল বর্ণালীকে দেখে। বউয়ের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল নয়। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকে কোদাল দাঁত। খড়ম পা, মানায় নি দুজনকে।

যা সত্য, লোকে তা বলবেই ; তা নিয়ে ক্ষোভ-দুঃখ করে লাভ নেই। যার যা আছে, সে তো থাকবেই। যে যা পাবার সে তা পাবেই, তবে কেউ যদি বলে—কুমারী-কালে একে দেখেছি একজনের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে সেটা দোষাবহ হবে। কথাটায় রঙ চড়িয়ে পাঁচকান হলে সুখ্যাতি বাড়বে না। পাঠ্য জীবনে কর্মজীবনে ছেলে-মেয়ে একত্রে পথ চললে যে অসৎ হয়ে যায় না, সে কথা কজনে মানতে পারে ?

চাহিদার অন্ত ছিল না পাত্রপক্ষের—বর্ণালী দেখতে সুশ্রী নয় বলে। বিশ্রী ও সুশ্রী বনে পয়সার জোরে। গুণটা কেউ দেখে না বড়। যে যা বলে আনন্দ পায় বলুক কী আসে যায় তাতে! মেয়েরা পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হয়ে দেহ-মন-প্রাণ বিলিয়ে দেয়। তাদের নেবার বেলায় কত না দরাদরি, নাক কুঁচকানো। যা আছে তা-ও চাই। এ-বেলায় ছেলের ঘরে অনেক কিছু বাড়ন্ত হয়ে যায়। ঘর সাজিয়ে না দিলেই নয়। গয়নাও চাই ভরি ওজনে মেপে।

পরিশেষে পরম আকাঙ্ক্ষিত ইহকাল পরকালের জনকে পেল বর্ণালী। মলয় এখন তার সর্বস্ব। কারণে-অকারণে বারংবার সে ঘোরাঘুরি করছে বর্ণালীর কাছ থেকে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে হাসিখুশি ভাবটাও। মলয়ের মায়া মায়া করুণ চেহারা বর্ণালীকেও টানছে। হলই বা লোকটা একটুখানি রোগা পটকা। রূপ ধুয়ে কেউ জল খায় না। গুণ তো আছে। আসল মানুষটা সামনে-সম্মুখে থাকলেও বর্ণালী পারছিল না শুভেন্দুকে ভুলে থাকতে।

বিয়ের এক দিন বাদেই বউভাত। ফুলশয্যা। শুভেন্দু এল উপহার নিয়ে। অফিস থেকেও অনেকে এল। বর্ণালী পেল কত উপহার-সামগ্রী। পেল আরও কত ফুলমালা, তা হলেও শুভেন্দু যা কিছু দিয়েছে তার সমকক্ষ নয় যেন কোনটাই। ওর দেওয়া রজনীগন্ধার তোড়াটা আঁকড়ে ধরেই সে বসে থাকল। খেতে যাবার ডাক পড়ল, যাবে কি, পা বইছিল না, সাজগোজে শরীরটা ভারী ভারী লাগছিল।

খেতে হল, শুতেও হল। প্রশ্ন জাগছিল মনে অগুনতি, ধুকপুক করছিল বুকটা, কে জানে মলয় কীভাবে চলতে চায় না-চায়। কেমন ব্যবহার করে না-করে। সে চাইছিল যতই ক্লান্তি আসুক চোখে যেন ঘুম না নামে। মলয়কে সে চেনা-জানার চেষ্টা করেছিল বিয়ের আসরে। মলয় বরাবরই লাজুক স্বভাবের। মেয়েদের সঙ্গে না পাবতে কথা বলেনি, মেলামেশা তো দুরন্ত। বিয়ের আগে বরযাত্রীও যায় নি, এসব নিজেই কবুল করেছিল।

ফুল-আতর সুগন্ধেভরা পালঙ্কে এক নারী ও পুরুষ। হৃদয়তন্ত্রীতে শিরা-ধমনীতে বাজবে তাদের নতুন জীবনের নতুন সুর। স্পর্শে-আলাপনে থাকবে তারা বিভোর। এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মলয় শুতে এসে বার কয়েক ঢোক গিলে অন্য কথা পাড়ল—'তোমার হাতের রান্না খেতে চাই দু-একটা দিন। পারবে না রান্না করে খাওয়াতে?'

—'কেন পারব না গো! আমি তো তোমারই। তুমি যা বলবে তা কি আমি না শুনে পারি? রান্না করে খাওয়াব, ভাল না লাগলে নিন্দে করবে না তো?'

—'যা দেবে অমৃত জ্ঞানে খেয়ে নেব। ঘরের নিন্দে, তোমার নিন্দে আমি করবই বা কার কাছে? আমার আর কে আছে বল? আমি জানি ডলির মায়ের চেয়ে তুমি মন্দ রাঁধবে না।'

—'তুমি কী করে জানলে আমি মন্দ রাঁধি না। শুনে রাখ, এমন কাজ আমি করবই না, যাতে কাজের লোক বেকার হয়ে পড়ে।'

—'ও কথা কেন বলছ! ঝিয়ের জায়গা পূরণ করতে তোমাকে

আমি আনিনি। তুমি ঘরের বউ। বাইরেও কাজে বেরবে। তোমার ওপর চাপ পড়ুক মোটেই তা চাইব না।'

—'দু-তিনদিনে এতই যখন দরদ পড়ে গেল, ওগো দরদিয়া, বলি শোন, একঘেয়ে কোন কিছু আমার পছন্দ নয়। আজ যেটা হবে, কাল সেটা বাদ।'

—'আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে'—বলতে বলতে মলয় পাশ ফিরে শুল, নাক ডাকতে থাকল।

কথা বলতে না বলতে এমন 'মিলন মধু রাতে' পুরুষ মানুষ যে ঘুমতে পারে বর্ণালী তা জানত না। তাদের মিষ্টি মধুর কথোপকথনে কেউ আড়ি পাতেনি তো! মলয়ের কানের কাছে মুখটা এগিয়ে বর্ণালী বলে উঠল—'কী গো! আর কিছু বললে না তো? না বলবে তো থাক, থাকো তুমি ঘুমিয়ে। ভোরের দিকে আমাকে ডেকে দিও কিন্তু।'

কে শোনে কার কথা। মাথায়-কপালে হাত ঠেকিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল মলয়। উষ্ণতাহীন, নেতিয়ে পড়া যুবা মানুষটি। বর্ণালী ওকে কাত করে শুইয়ে দিল।

অসাড় হয়ে পড়ে থাকল, থেকে থেকে হাই তুলল বর্ণালী। খটকা লাগল মনে। শুভেন্দু কি না-জেনে না-বুঝে অলস কুঁড়ের হাতেই গছিয়ে দিল তাকে, বলল— ধৈর্য-সহ্য রেখ, যেভাবে হোক মানিয়ে নিতে হবে তোমাকে।

সেই ধৈর্য-সহ্যের একটা সীমাও তো আছে, মানিয়ে নেওয়াও কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব?

*

*　　*

দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি গিয়েছিল বর্ণালী। গিয়েই জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। নিজের লোকদের সঙ্গে শুভেন্দুকে দেখার জন্য মন তার টানছিল।

অনেকে আসছিল দেখা করতে। ওর নতুন জীবন সম্পর্কে ছিল তাদের প্রশ্ন-কৌতূহল। যতটা জানানো সম্ভব জানাল, নিন্দা-মন্দ করবে কার? কতটুকুই বা জানতে বুঝতে পেরেছে মানুষটাকে। একথাটা বলতে পারে, স্বামী তার অমানুষ নয়, ভদ্র-বিনয়ী-স্বল্পভাষী।

ওকে যতটা আদর-যত্ন করা সম্ভব মা করলেন। বেশ কয়েক পদ রান্নাও হল। যার জন্য আয়োজন খেল সে যৎসামান্যই। খেয়ে হজম করতে পারলে শরীর-গতর সারত।

খাওয়ার পর শোওয়া। মায়ের পাশে এক বিছানায় আর নয়। শয্যার বড় আকর্ষণ, সেই আকর্ষণে টেনে নেয় একে অপরকে। বাধা-বন্ধুর পথ পেরিয়ে—হিমপ্রবাহ-বাদলধারা গরম-গুমোট উপেক্ষা করে ছুটে আসে একজনের কাছে আর একজন। বলতে চায় সৃষ্টি রসাতলে গেলে যাক, তুমি আমি যেন থাকি। রাতটুকু যেন বৃথাই না যায় ফুরিয়ে।

কিন্তু তেমন তেমনই কাটছে কি তাদের রাত? তেমনই করে বইছে কি তাদের এক ছন্দবদ্ধ মধুর জীবন?

নবদম্পতিকে অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে হয় বিয়ের চারদিনের মাথায় এসে। কথাটা কতখানি সত্য বর্ণালী জানে না। পাড়াতুতো বউদি হয়তো বা তাদের গোপন সম্পর্কের আঁচ পেতেই ডেকে নিয়ে শুতে দিলেন তাঁর ফাঁকা ঘরটায়। সাবধানও করে দিলেন—'খাটটা একটু নড়বড় করে, সতর্ক হয়ে থেকো ঠাকুরঝি!'

বর্ণালীর গায়ে একটা টোকা মেরে বউদি টেনে দিয়ে যান দরজাটা। পাড়া নিঝুম, ওরাও প্রায় নিঝুম। যারা সদ্য বিবাহিত তাদের তো জেগে থাকারই কথা। বলবার কথা। তোমার আমার এ-রাত যেন না ফুরোয়।

সে সব নয়। চলে গেল ওরা ভিন্নতর প্রসঙ্গে।

বর্ণালী বলল—'আসছে মাসে ডলির মাকে রেখে দিয়ে যাব মায়ের কাছে, মাকে সাহায্য করবে। তুমি কী বল?'

—'তোমার মতেই আমার মত। ওদিকে কাকে রাখবে ঠিক করলে?'

—'লোক রাখবই না, আমাকেও সময় কাটাতে হবে তো। সাত-তাড়াতাড়ি শুতে না এসে রাত জেগে হেঁশেলের কাজ এগিয়ে রাখব।'

- 'শোবে যখন আমি ঘুমিয়ে থাকলে ডাকবে তো?'

—'আমার অত ঠেকা নেই। আমি আমার মতো বিছানা বালিশ পেতে যেখানে পারি পড়ে থাকব।'

গায়ের কাছে একটুখানি গা বাড়িয়ে শয্যা নিতে না নিতেই চোখ জুড়ে আসে মলয়ের। বলে—'ঘুম পাচ্ছে।'

বর্ণালী কথা বাড়ায় না, পাখার বাতাস করে। ভাবে, মাপ ছাড়া খাটুনি সয়না ওর ধাতে। একদম ঠাণ্ডা-নরম বেটাছেলে। তাকিয়ে দেখতে থাকে মুখখানা টিমটিমে লণ্ঠনের আলোতে। দেখতে কুৎসিত-কদাকার নয়। গড়নটা হালকা হলেও মলয় সুন্দর মুখের অধিকারী। ওর কানের কাছে সেদিনও স্বগতোক্তি করে বর্ণালী—'কেমন পুরুষ লোক গো তুমি?'

মলয় একবার 'উঃ! আঃ!' করে পাশ ফিরে শোয়।

বর্ণালীকে রেখে মলয় চলে এসেছিল পরদিনই। বর্ণালী আরও দিন তিনেক থাকল মায়ের কাছে। তারপর রওনা হল অফিসের পথে বাড়ি যাবে বলে। ট্রেনে উঠে একটা সিটও পেয়ে গেল বসবার। বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। মলয়কে দোষ দিতে পারে না। এক এক সময় চোখ বুজে এলে কিছু করারও থাকে না।

সোনা-দানা কমই পরেছে, হারছড়া রেখেছে ব্যাগে। শাড়ির আঁচলে ঢাকা ব্যাগটা। ঘোমটাও টেনেছে কানদুটো ঢেকে। ট্রেন-বাস-ট্রামে যা-সব ম্যাজিক-হাতসাফাই। বর্ণালী ইচ্ছে করেই ওঠেনি মহিলা কামরায়। সেখানে প্রতিনিয়ত ভিড় করে পুরুষেরা, ডাকাত-ছিনতাইবাজ মিশে থাকে যাত্রী সাধারণের মাঝে। জবুথবু কেঁচো হয়ে

পড়ে অস্ত্র-উঁচিয়ে কাউকে এগোতে দেখলে। মরণভীতি মানুষের সহজাত। ক্ষমাভিক্ষে দিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে গেলেও নীরবতা পালন করে। জ্ঞান হারায়। ছুরি-ছোরা মরচে-ধরা কিনা, পিস্তল পাইপগান নকল, না আসল কে আর দেখছে। চার-পাঁচজনের ভীতি প্রদর্শন আস্ফালন চকিতে অসহায় কাবু বানিয়ে দেয় কামরাভর্তি যাত্রীসাধারণকে।

গন্তব্যে ট্রেন থামতেই লোক ওঠে-নামে।

কে যেন বর্ণালীকে ডাকে—'ও দিদি, শিয়ালদা এসে গেল যে। এখনও ঘুমোচ্ছেন।'

ধড়ফড়িয়ে জেগে গেল বর্ণালী। মামার সঙ্গে আটটা বিয়াল্লিশের ট্রেনটায় চাপলে অসুবিধাই হত না।

হেঁটে-ছুটে চলেছে অগুনতি মানুষ তাদের কর্মস্থল অভিমুখে। অফিস পাড়ার পথ বেয়ে বর্ণালীও এগোচ্ছে। ভিড়-ভাট্টায় স্বচ্ছন্দে হাঁটবার উপায় নেই, পথের মাঝে নানারকম গাড়ি-বাস-ট্রাম-ঠেলা টানা-রিকশা-স্কুটার। ফুটপাথে মানুষের পায়ে-পায়ে, গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি। লোকগুলো ছুটছে জীবনপণ করে। রাস্তায় যানজট পাকিয়ে উঠলেও এগিয়ে চলেছে মানুষের সুদীর্ঘ লাইন।

হঠাৎ সেই লাইন থেকে সরে এল বর্ণালী শুভেন্দুকে দেখে। শুভেন্দু একটা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরল। তারও লেট হয়ে গেছে।

শুভেন্দু জানাল—'সরকার 'সুষ্ঠু বদলি নীতি' চালু করছে। পাঁচ-ছ'বছর যারা একই অফিসে রয়েছে সরিয়ে দেওয়া হবে তাদের। আড্ডা-জমানো, কাজে শৈথিল্য আর নয়।'

—'যখনকার ভাবনা তখন ভাবব। দশজনের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। কেমন আছ বল?'

—'আমার আর থাকা! বাপনের কম্প দিয়ে জ্বর আসায় পরীক্ষা দিতে পারল না। কালও জ্বরে বেহুঁশ ছিল। শুক্লাদি ও মনীষার সাহায্য না পেলে কী যে হত, ওর মা কাছে থাকলে তো ভাবতামই না। সব চেয়ে স্নেহ-আদর-ভালবাসার জিনিস ছেলেপুলে। তার ভবিষ্যৎ

যদি ছারখার হয় আমারই অন্যায় দোষে, তবে সে অনুশোচনা আমার ঘুচবে না কোনদিন।'

ছলছল করতে থাকে শুভেন্দুর দুটো চোখ, মনটা ওর কোমল, মায়া-দয়াও আছে।

শুভেন্দু বলল—'হাঁটাহাঁটি করে ছুটে ছুটে তোমাকে অফিসে না গেলেও চলবে। বেলা দুটোয় তো ছুটি, আবার যে আমরা সরকারে আসছি বিরাট গরিষ্ঠতা নিয়ে। ময়দানে তারই বিজয় উৎসব।'

—'লোকগুলো তাই বাস-লরি বোঝাই হয়ে চলেছে। তুমিও তো যাবে।'

—'না গেলে চলবে কী করে! কাল আসছ তো অফিসে?'

—'দেখি, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।'

বর্ণালী যতই চাইছে শুভেন্দুকে ভুলতে, মুখ ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে, ততই বেশি করে ভাবিয়ে তুলছে। ওকে চিরদিনের জন্যে পাবার সৌভাগ্য হল না বর্ণালীর। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ওর জন্যে জায়গা থাকবে তাঁর হৃদয় আসনে। থাকবে নিত্যদিনের ধ্যান-ধারণাতেও। কাছে যেতে না পারে দূর তফাত থেকে ওর ত্যাগ-স্নেহ-দরদী মনের কথা স্মরণ করবে।

বর্ণালী দমদম গেল। সত্যি বলতে স্বামীর উপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল তার। দূরছাই করবার জন তো নয়। যেটুকু গলতি-ত্রুটি আছে থাকুক—অনভিজ্ঞও অভিজ্ঞ, অচলও সচল হয়ে ওঠে এক-দিন- যদি তা হয়ও।

মলয় বসেছিল পথের দিকে তাকিয়ে, ওকে কাছে পেয়ে এগোল। আদর জানাতে চাইল।

বর্ণালী বলল—'থাক, থাক হয়েছে, বাড়িতেই তো রয়েছ। আমাকে আনতে গেলে না কেন?'

—'সময় পাইনি। সবে ফিরছি অফিস থেকে, আজ যে হাফ-ডে।'

—'মাঠে না-গিয়ে বাড়ি চলে এলে?'

—'গন্ধে-গন্ধে এলাম। তুমি আসবে আমি জানতাম।'

—'তুমি দেখছি অন্তর্যামী।'

—'স্বামীকে কেউ কেউ তা-ই তো বলে।'

—'তুমি বলতে পার দিনরাত কতবার তোমাকে ভাবি?'

—'সকাল থেকে রাত্র, শয্যা ত্যাগের পর শয্যায় ওঠা পর্যন্ত প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তত এক থেকে দুবার ভাব। এবার তুমি বল তো—'

—'বউয়ের জন্যে ভেবে ভেবে তো তোমার আহার-নিদ্রা চলে গেছে। বাজে বকিও না, কাজের কথায় এস। শুনেছি অফিসে অফিসে ফাঁকিবাজদের দমন করতে এবার কড়া স্টেপ নেবে সরকার'

—'নিতেই পারে। অবশ্য মাসখানেক ছাড় পেতে পার। অফিসে এসময়ে তো কাজই নেই। আলোচনা-সমালোচনাই চলছে—চলবে। আজ বিজয় উৎসবে জড় করা হবে ক'লক্ষ লোক। কতজন তার টসকে-পিষ্টে যাবে, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবে তারই হিসেব-নিকেশ কষা হবে। ভোটের ফলাফলের ওপরও চলতে থাকবে সমীক্ষা, নানা মুনির নানা মত।'

—'বল গো বল, থামলে কেন? কে বলেছে তুমি কথা বলতে অনভ্যস্ত। গড় গড় করে তো খাঁটি কথাগুলোই বলে দিলে।'

—'মনের মতো শ্রোতা না পেলে তো কথা বলা যায় না। যা বলেছি মিথ্যে বলি নি তো?'

—'মিথ্যে কেন বলবে! এই রকম "যাহা বলিবে সত্য বলিবে।" ক-টা দিন একলা কেমন কাটালে?'

—'ও-কথা জিজ্ঞেস করতে হয়। তুমি এলে তা-ই বাঁচলাম।'

—'কথায়-কাজে মিল নেই তোমার। ফলে আমাদের মধ্যেও মিলের চেয়ে অমিল বেশি। বলি, পড়ে পড়ে তো ঘুমিয়েছ ক'দিন। আজ শুতে-না-শুতে চোখ বন্ধ করলে শুনছি না।'

—'কী করতে পারি। শুলেই যে চোখ বুজে আসে। আজ কথা দিচ্ছি বেশি ঘুমোব না, থাকবও না তোমাকে ছেড়ে যেখানে তুমি

সেখানে আমি। চলব আমরা পায়ে পা মিলিয়ে।'

—'তোমার কথায় কাজে মিল থাকলে তো কথাই ছিল না। আর কিছু বলবে তো বল। মন্ত্রিসভা গঠন, দপ্তর বণ্টন নিয়ে কী আলোচনা করছ?'

—'হ্যাঁ, রাজ্যের চিন্তাও করা হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা নেতারাও যেমন চালাচ্ছেন, আমরাও চালিয়ে যাচ্ছি। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেবে। চল, এই ডামাডোলের বাজারে ঘুরে-টুরে আসা যাক কোনও খান থেকে।'

—'কোথায় যাবে বল, তীর্থ-ধর্মস্থানেই চল না। নবদ্বীপ নয়তো তারকেশ্বর।'

—'গেলে দুজনে যাব না কিন্তু।'

—'দুজনে কেন যাব? মা যাবেন, বিলু যাবে, শ্যামলীও যাবে।'

মলয় সবাইকে নিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল।

ওর একলসেঁড়ে ভাব নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ এসে জুটলে ওজর-আপত্তি দেখায় না। সরল সিধে মানুষটার কাছে শুভেন্দুর কথা সে পেড়েছিল। বলেছিল—'শুভেন্দু পরোপকারী। ছেলেটার অনেক গুণ আছে। আপস করে না সে অন্যায়ের সঙ্গে, আমাদের উপকারী বন্ধু বলতে পার। আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসি।'

মলয় জানিয়েছিল – 'মেয়েরা অবশ্যই পারে একের বেশি পুরুষকে ভালবাসতে। ভালবাসা ভালবাসাই। তবে সব ছেলেমেয়ে ঘনিষ্ঠ করে পেতে চায় তো একজনকেই।'

বর্ণালী শুভেন্দু সম্পর্কে তাবৎ কথাই বলেছে মলয়কে। শুভেন্দুর পাশে বসে বলেছে দুটো মনের কথা, স্বাস্থ্যদীপ্ত চেহারা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। চলাফেরার মধ্যে সুশৃঙ্খল ধীর-স্থির ভাব। ওর হাসি হাসি মুখ কাছে টানত অনেককে, দাদা-দিদি-ভাই-বোন বলে ও সম্বোধন করত সবাইকে। যে শুনত ওর সাদর সম্ভাষণ সেই তাকাত ফিরে। বসাত কাছে ডেকে।

শুভেন্দুর দিদি না-থাকায় সে 'দিদি' ডেকেছিল শ্রীমতী গুপ্তকে। প্রথমে সাড়া দেন নি তিনি ওর ডাকে। নিন্দাকারীরা তখন নিন্দা-অপবাদও ছড়িয়েছিল শুভেন্দু ও বর্ণালীর নামে। তাদের দেখা যেত পার্ক-রেস্তোরাঁয়। অফিসে বসে ভাগে-যোগে টিফিন খেত। মুখে-মুখে নানা আলোচনাও চলত তাদের নিয়ে। বর্ণালীর দিকে পক্ষপাত থাকলেও শুভেন্দুকে এড়িয়ে চলতেন শ্রীমতী। বিয়ে করে বউকে নাকি রাখতে পারে নি। বউ পোষবার মুরোদ যখন নেই, কেন তবে কুমারী মেয়েকে নিয়ে অমন ঢলাঢলি? স্ত্রী-ত্যাগী দোজবরে বিয়েতে সমর্থন নেই তাঁর।

বর্ণালীই শ্রীমতীর ভুলটা ভাঙিয়েছিল। একথাও জানিয়েছিল—'শুভেন্দু উপকার বই ক্ষতি করে নি আমার। যে আমার ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়েছে দাঁড়িয়েছে তার বিপক্ষে। বলেছে, সুপাত্রের সন্ধান পেলে আমি বলব। তোমার মা আমার সাহায্য নিতে আপত্তি না করেন তো পয়সা-কড়িও দেব তোমার বিয়েতে।'

ক্রমে ধ্যান-ধারণাটা বদলেছিল শ্রীমতীর। বুঝতে পেরেছিলেন শুভেন্দুর ব্যথাটা। জোয়ান যুবা ছেলেটা বউছাড়া হয়েছে যে কারণেই হোক তার মনের শূন্যতা হাহাকার তো সহজে পূর্ণ হবার নয়। শুভেন্দুর মতো ছেলে মারাত্মক দোষী-অত্যাচারী হতেই পারে না। ঘরে যাকে এনেছিল সে হয়তো ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়। একটু বাড়াবাড়ি মেয়ে-ঘাঁটা স্বভাব অজস্র পুরুষেরই থাকে। সেটা সয়ে-মানিয়ে নিতে হয়। আগে জানলে লিপিকাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করতেন শ্রীমতী।

'তা না হয় হল। হ্যাঁরে বর্ণালী, দিব্যেন্দুর সঙ্গে যে-ভাবে জড়িয়ে পড়ছিলি তাতে তো মনে হয় না তুই ধোয়া তুলসীপাতা।'—শ্রীমতী মন্তব্য করেছিলেন আগে কোনও একদিন।

বর্ণালী যা ঘটনা তা জানিয়েও দিয়েছিল। আপন ইচ্ছেয় খারাপ না হলে কেউই পারে না কাউকে খারাপ করতে, এ কথাও

শ্রীমতী মেনে নিয়েছিলেন। সাবধানও করেছিলেন—'দিব্যেন্দুর চাওয়া-পাওয়াকে নস্যাৎ করে দিয়েছিস তুই। তোর সুখ ওর কাম্য নয়। সাবধানে চলবি-ফিরবি। শুভেন্দু কতদিন তোকে আগলাবে বলতো। তোর নিরাপত্তার জন্যে পথ এখন একটাই, তোকে যদি তোর স্বামীর দপ্তরে অ্যাটাচ করিয়ে দেওয়া যায়।'

এই রকম কথা হয়েছিল, কাজ আর এগোল না। অফিসেও চলতে থাকল কড়াকড়ি।

*

* *

চাপা পড়ে গেল সরকারি দপ্তরে দপ্তরে 'সুষ্ঠু বদলি নীতি' চালু হবার কথাটা। নির্দেশ দেওয়া হল কর্মচারিদের যথা সময়ে অফিসে হাজিরা দিতে—রাখতে কাজকর্ম সংক্রান্ত হিসাবপত্রও। দেওয়ালে দেওয়ালে পড়ল পোস্টার—'কর্মীরা সময়ে আসুন, সময়ে যান। টেবিলে ফাইল জমতে দেবেন না।'

কারও কারও পড়ল মাথায় হাত। কেউ অভয়ও দিল—'দেখই না যেমন চলছিল তেমনই চলবে, কটা দিন যেতে দাও। এ রকম অনেক দেখা আছে।'

কেউ বা বাক্যে প্রবাদ টেনে আনল—'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।'

নিজেদের দোষ ঢাকবার সাফাইও গাইল একজন—'অফিসে তো কাজই নেই, কাজ থাকলে কেইবা চেয়ার ছেড়ে নড়ত।'

আর একজন সায় দিল সে-কথায়—'একসময় আমরা কাজ করেছি, টিফিন খাবার ফুরসত পেতাম না। বাথরুম থেকে ফিরতে দেরি হলে খোঁজ খোঁজ রব উঠত। গাধার খাটুনি ছিল, ছিল অফিসারের দাপটও।'

কাগজ-কলম থেকে মুখ তুলে শ্রীমতী গুপ্ত বললেন—'যারা অনলস-খাটিয়ে তারা তখনও করেছে, এখনও করছে। সব সেকশনের অবস্থাটা

আজও হাত গুটিয়ে বসে থাকার মতো নয়। ডেসপাচ-রিসিভ-এসটাব্লিশমেণ্ট—অ্যাকাউণ্ট সেকশনগুলিতে কাজ থাকেই। তবে একঘেয়েমি এসে যায় এই যা। এর বিহিত হতে পারে সবাইকে সব সেকশনগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ করালে।'

বর্ণালী বসেছিল ভবনাথের চেয়ারে। ভবনাথ না থাকলে সে করে দেয় ওর কাজ। বলল—'আমি তাহলে রেকর্ডে বসে কাজটা খারাপ করিনি দিদি। টাইপ সেকশনে যেদিন লোক কম থাকে টাইপও করি, কিন্তু দুঃখটা হল আমার অনুপস্থিতিতে কেউই এগিয়ে আসে না আমার কাজের লাঘব করতে।'

কথাটা বলে বর্ণালী আড়চোখে তাকাল শুভেন্দুর দিকে। গাদা খানেক ফাইল, স্তূপাকার প্লান-নকশা নিয়ে বসেছিল সে। বলল—'বর্ণালী আমি তো কাজ করতেই চাই। সে জন্যেই তো এ-ঘরে এসে বসা। তোমার কাজগুলো যে শিখে নেব সময় পাচ্ছি না।'

—'কেরানির কাজ তুমি কেন করবে, এমনি আমি বললাম।'

পাশেই এস্টিমেটিং সেকশন জন চারেক এস্টিমেটরকে নিয়ে। ইচ্ছে করেই সেখানে বসছে না শুভেন্দু। ও-ঘরে যারা বসে তারা কাজ-কর্ম বোঝে না করেও না। এমন এক সময়ে তারা তাদের যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছিল, চাকরিতে ঢুকেছিল, যখন গায়ের জোরে, বোমা-ছোরা দেখিয়ে, জোর-জুলুম করে, সবকিছুই আদায় করা হত।

ওইসব কম-জানা লোকের কাছ থেকে কী করে কাজ আদায় করা যাবে। নিজেরা অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ তো অন্যকে কী দেবে? নোটিস-সার্কুলার যাই দেওয়া হোক, কাজের পরিবেশ আসে না। আরাম-প্রিয়তা, খাটা-খাটুনির ভয়ে পালিয়ে বেড়াবার, আড্ডা মজলিস জমাবার মানসিকতা এখনও রয়েছে। পূর্বেকার মতোই সব চলছে। প্রেম-প্রেম খেলাটা—চাকরি বাড়ন্ত হবার পর কমতির দিকে। আসছে না নতুন ছেলে-মেয়েরা। ও খেলায় ছিল যাদের বাহাদুরি, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে তাদের।

চিৎকার কোলাহল কমা দূরের কথা, বেড়েছে বরঞ্চ। ফুটপাথের দোকান পসার উঠে এসেছে অফিসের টেবিলে টেবিলে। মদত দিচ্ছে তাতে কর্মীরাই। দোকানি বলে—'জায়গায় বসে মাল পাবেন, বেকারদের দেখুন দাদা। জামা কাপড়ের পিস, মিঠাই মিষ্টি, চাটনি জেলি, শস, আচার, কাসুন্দি থেকে বারুইপুরের পেয়ারা—জয়নগরের মোয়ার দরদস্তুর এবং জিনিসের গুণপনার ব্যাখ্যা করতে করতে গলা ওঠা নামা করে। অফিসে দস্তুরমতো বাজার মিলে গেলেও আপত্তি ওঠে না।

কিছুতেই যেন কিছু হবার নয়। মানে না কেউ কাউকে। শোনে না কারও কথা কেউ। কর্মচারি মহলও হয়তো বা ওই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত।

কী করে অফিস-দপ্তরের এই বেহাল অবস্থায় হাল ধরা যায়, কাজের গতি ফিরে আসে সে-সব নিয়ে ভাবাভাবি নয়। নিয়মিত অফিসে হাজিরা দেবার ব্যাপারটাই পাচ্ছে অগ্রাধিকার। কখন কে আসছে সুড়সুড় করে পালাচ্ছে অফিস থেকে। এক একদিন অফিস-কর্তা সেটা দেখছেন, নিয়মভঙ্গ করায় মুখও খিঁচোচ্ছেন—'এত লেটে আসা হচ্ছে কেন?'

—'চিৎপুর ব্রিজে উঠে তেতাল্লিশ নম্বর বাসটা স্যার—'

—'চাকা প্যাংচ্যার হয়ে গিয়েছিল, না? একই ঘটনা দুদিন বলা হয়ে গেছে। আপনার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেট করে আসাটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তেতাল্লিশ নম্বর না ধরে চৌত্রিশ ধরুন গে। যান—নেকস্ট বলুন—'

—'স্যার মেজো ছেলেটার পরীক্ষা চলছে, একটু দেখিয়ে দিতে হচ্ছে। ছেলেটা অঙ্কে একটু কাঁচা।'

—'তিন ছেলে আপনার! আপনি তো অঙ্কই বোঝেন না। কাঁচাকে পাকা করে তুলবেন কি সাধ্য আপনার? দশটার অফিস ধরতে ঘর থেকে কটায় বেরোতে হয় সেই অঙ্কটা পারেন তো কষুন।

কাল থেকে যেন লেট না হয়। একদিন মাফ করলাম। নেকস্ট—'

—'আমার স্ত্রী—'

—'প্রেগন্যান্ট তো? যা বলবেন আমি জানি। তা এলেন কেন। ব্যথাটা দেখছি আপনারই উঠে গেছে। যান বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর দিকে ভাল করে দৃষ্টি রাখুন না-না অ্যালাউ করতে পারছি না। আরে বটুকবাবু, আপনার কী খবর?'

—'অফিসে আসবার পথে আলিপুরের কাজটা চুকিয়ে এলাম। সই করব।'

—'অবশ্যই। আপনি তো 'অন ডিউটি' ছিলেন। প্রেস এণ্ড ফর্মস-এ গিয়েছিলেন রিক্যুইজিশন নিয়ে। আপনার আরও কাজ আছে, আমার টি-এ বিলের চেকটা রেডি হয়েছে কি না একবার খবরটা নিয়ে আসবেন।'

'প্রাতঃপ্রণাম হুজুর।'—জোড়হস্ত হয়ে একজন সাহেবের চেম্বারে ঢুকল।

—'লজ্জা করছে না সাড়ে বারোটায় অফিসে ঢুকতে?'

—'পর পর দুটো গাড়ি ফেল হয়ে গেল হুজুর, হাঁটতি হাঁটতি আসতি হয় সেই মুড়াগাছা থেকে।'

—'যে-গাছা থেকেই আসুন 'অ্যাবসেন্স' মার্ক করে দিয়েছি, যান—'

কর্মীরা আসছেই। আসছে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকা থেকে ছড়ানো-ছিটানো ঘর-কুঠুরি: বাগনান-বর্ধমান-বসিরহাট-বনগাঁ, মাজদিয়া-মগরা-মথুরাপুর। এরই কাছে-দূরে তাদের ক্ষুদ্র গাঁ। কারও কারও মাথার চুল অগোছালো, জুতোতে ধুলো ময়লা, জামাকাপড়ে ঘাম।

আরও দুজন মূর্তিমান এসে হাজির হল সাহেবের সামনে।

'লেট হয়ে গেছে, ক্ষমাভিক্ষে করে দেন স্যার। আমাকে রূপনারায়ণ-পুর থেকে আসতি হয়।'

—'তা বারবেলায় রূপ দেখাতে 'আসতি' হল কেন! কলকাতায়

থাকতে কে আপনাকে মানা করেছে?'

প্রশ্নটা জ্বালা ধরায়—'শহরে মাথা গোজার ঠাঁই পালি থাকতাম না পোড়া মফস্বল গ্রামে। শহরে থাকার ব্যবস্থাটা করেই দেন না স্যার।'

সাহেবের কথা গায়ে লাগে অন্যজনেরও। বলে—'গাঁ-গঞ্জের মানুষকে হেলার চোখে দেখবেন না স্যার। আমরা বড় কষ্টে থাকি, সেদ্ধ ভাত দুটো নাকে-মুখে গুঁজে আসলাম ছুটে ছুটে। জানেন আমাদের ফেচাং-বাধা অজস্র। সংসার বাঁচাতি লড়াই, চাষ-বাস করতি লড়াই, অফিস আসতি লড়াই। কোনদিকে যাই বলেন তো স্যার। বাবুরা তো খাসা আছেন। গ্রাম-ঘরের চাষাদের চাষ করা মাল—সবজি, টাটকা মাছ, চাল-গম, ফল-ফুল, এখানকার বাবুদেরই ভোগে লাগে। আমাদের অভুক্ত থাকতি হয়। আমাদের সুযোগ-সুবিধে বলতে কিছু নেই। বিদ্যুৎ পাইনে, পাইনে কুপি জ্বালবার কেরোসিন তেল, ন্যায্য দামে একখান পাঁউরুটি কিনতি হলিও এইখেন থেকে কিনতি হয়, লাইনে দাঁড়াতি হয়।'

—'আমার কাছে প্রলাপ বকে লাভ নেই। অনেক কাঁদুনি গাইতে পার তোমরা। হাজিরাটা ঠিকমতো দাও। যাও—নিজেদের কাজ গুছোও গিয়ে।'

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে সিন্‌হা সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বেজার মুখে।

বলা বারোটায় হাজিরা খাতাটা উঠিয়ে রাখা হয় আলমারিতে। ছুটির আগে তা নামানো হয় না; অফিসে এসে এবং যাবার সময় খাতায় নির্দিষ্ট 'অ্যারাইভাল' ও 'ডিপারচ্যার' ঘরে দু-বেলা দুটো সই করার নিয়ম, তা না-করে এলে তলব করা হয় কৈফিয়ত। টিফিনে বেরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিরে না আসা, হরদম বাড়িঘরে কেটে পড়া আর বরদাস্ত নয়। কে কখন সিট ছেড়ে ওঠে, ফেরে কি ফেরে না দেখা হচ্ছে।

দিনকয়েক 'কঠোরতা' দিনকয়েক 'শিথিলতা' এভাবেই চলতে থাকে। কোনও কোনদিন সাহেব কলেজ থেকে মেয়েকে বাড়ি পৌঁছতে যান, ট্যুরে বেরন, মিটিং-কনফারেনস বসে মহাকরণে, ডেকে পাঠানো হয় সাড়ে তিনটে-চারটেয়। পাঁচটার আগে আসবেন না এমন কথা থাকে। খাতা দিয়ে যান বড়বাবুকে, খাতা দেখার এক্তিয়ার নেই বড়বাবুর। কাল সকাল সকাল এসে সই করে দেবেন ভেবে একটু ঝুঁকি নিয়ে কিছু কর্মচারী চলে আসেন। পরদিন কোনও কারণে অফিসে আসতে বিলম্ব হলে সইয়ের ঘরে বসানো হয় লালকালির প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এমনও হয়ে থাকে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই চেয়ারগুলো ফাঁকা, বড়বাবু খাতা ছাড়েন নি। এমন সময় সাহেব এসে হাজির। একটু ঢিলা-লুজ দিলে যে-যার সুযোগ-সন্ধানে থাকে. সমস্যা মানুষকে বিপথে চালিত করে। সমস্যা মানুষের এখন ঘরে বাইরে সর্বত্র।

অফিস ছুটির পর মানুষে মানুষে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি লেগে যায়। সবারই তো ট্রেনের পথ নয়, পা গলানো দায় হয় তখন বাদুড়ঝোলা বাসের পাদানিতে। মালপত্রসহ চড়া সম্ভব হয় না অফিস ফেরতা কোনও যানেই। ক্রমশ ভিড় বাড়ে রাস্তায়, বাস-ট্রাম-ট্রেনে. দোকানে-পসারে। কম ভিড় বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন নেমে আসে সন্ধ্যা, চোখে দেখতে হয় অন্ধকার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে বহু রুটের বাস। শেষে যানবাহনও মেলে না।

যারা এই শহর থেকে মালপত্র কিনে থাকেন, অফিস ছুটির আগে দোকান-বাজারে না গেলে তাড়াহুড়োতে, ভিড়ভাট্টায় কেনাকাটা শক্ত হয়। তাই তো কাউকে কাউকে ছুটি হবার আগে অফিসের কাজ চুকিয়ে বাধ্য হয়ে বেরতে হয়, কেন তাতে রুষ্ট-ক্ষুব্ধ হন অফিসকর্তা।

হঠাৎ ই একদিন ফোঁটা-ফোঁটা গোচোনা পড়ে কলসি ভর্তি দুধে। যারা ফাঁকিবাজ নয়, ফাইল ফেলে রাখে না, অফিসে আসে আগে-ভাগে, যায় দেরিতে তারা অপরাধী বনে। শ্রীমতী গুপ্ত, ভবনাথের নাম ওঠে

অপরাধীর তালিকায়। সেদিন বেলা দুটো থেকে তিনটে অফিসে ছিল না ভবনাথ। এরকম প্রায়ই সে থাকে না। টিফিনে সে কোথায় যায় কেন যায় সে-কথা অনেকেরই জানা আছে। মুদি দোকানটা তার চলছে মোটামুটি। দু-হাতে দুই থলে ভর্তি ডাল-মশলা-চিনি-ময়দা কিনে নিয়ে ভবনাথ অফিসে ঢুকতেই বড়বাবু এগিয়ে এলেন। বললেন —'সাহেব ডাকছেন, দেখা করে এস। একবার ছাড়া পেলে আর যে আসতেই চাও না। সেদিন আর নেই। পোস্তা বড়বাজার বৈঠকখানা ঘুরতে হলে বড়সাহেব বা ছোটসাহেবের সম্মতি নেবে। আমাকে বলে গেলে চলবে না, গিয়ে বল ওদের বুঝিয়ে।-- শ্রীমতী গুপ্ত, হাতের কাজ সেরে আপনিও একবার বড় সাহেবের ঘরে যাবেন।'

বসা হল না ভবনাথের, বড় সাহেবের ডাক এসেছে। ছোটসাহেব অর্থাৎ সহকারি চিফ ইঞ্জিনিয়ার 'অ্যাটেনড্যানস্'-এর বিষয়ে নাক গলাতে চান না, শাস্তিবিধান অপেক্ষা আপস-রফার পক্ষপাতী তিনি, কাজ হওয়া নিয়ে কথা। তিনি চান যার যেটা ডিউটি সে তা পালন করুক। কাজকর্ম মিটিয়ে .য চলে যেতে চায় যাক।

সিনহা সাহেব এখন চিফ ইঞ্জিনিয়ার হলেও হাবড়ায় থাকতে ওঁকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দেখেছে ভবনাথ। একদা বিনা নোটিশে তিনি ওকে বরখাস্তের আদেশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিপত্র দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হত ভবনাথকে। গড়াতে-গড়াতে চলত রেলগাড়ি মাল আর মানুষ ঠাসা হয়ে। চারটে-সাড়ে চারটেয় গন্তব্যে যেত বেলা দুটোর ডাউন বনগাঁ লোকালটা ঢিকঢিকিয়ে। কম সময়ে বেশ কয়েকটি অফিসে চিঠি বিলি করতে হত। কত দিকে ছিল কত অফিস, রাইটার্স-নিউ সেক্রেটারিয়েট-মিত্র বিল্ডিং-মার্কেন্টাইল বিল্ডিং। আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতেও পাঠাতেন কেউ খবরাখবর নিতে। করতে হত সিনহা সাহেবের ব্যক্তিগত কাজও। মদ খেয়ে মাতাল হতেন, পান-জর্দা চিবোতেন হরদম। আরও দোষ ছিল তা তো জানতে কারও বাকি নেই। কর্তব্যে অবহেলা-অমনোযোগের অভিযোগে পদচ্যুত

করলেন ভবনাথকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এল—'ভব, তুই ঝগড়া-বিবাদ করেছিস কি সাহেবের সঙ্গে? লোপাট করে দিয়েছিস কি জরুরি চিঠিপত্র?

কারও পরামর্শ—'না-বুঝে অন্যায় করে ফেলেছিস সে কথাটা কবুল কর, চাকরি তোর থেকে যাবে।'

ভবনাথ জানিয়ে দিয়েছিল—'অন্যায় না-করে অন্যায় স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।'

অভিযোগটা ছিল মনগড়া। পরে সিনহা সাহেব জানতে চেয়েছিলেন—'তোমাকে আমি হেডঅফিসে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, তুমি তা না-করে কেন চলে এসেছিলে?'

ভবনাথ ওঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছিল। যা বলা যায় না তা-ও বলেছিল। অফিসের লোক থামিয়েছিল দুজনের তর্ক-বিতর্ক। বলে-কয়ে ভবনাথের চাকরিটাও রক্ষা করেছিল। নতুবা ওর ভাগ্যের চাকাটা কোনদিকে ঘুরত কে জানে!

সেই খেয়ালি লোকটার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ভবনাথকে।

যেতেই সিনহা সাহেব বলে উঠলেন 'অফিস থেকে ও-ভাবে কেটে পড়া তোমার অন্যায় হয়েছে। পথে নেমে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসলে আমাদের নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। বাইরে বেরিয়ে খুন-জখম করে যে ফিরছ না, তারই বা কি প্রমাণ!'

অত তলিয়ে ভাবে নি ভবনাথ। সাহেবের কথা নীরবে মাথা পেতে নিতে পারল না সে। রোখ চাপল গায়ের ঝাল মিটিয়ে ছোট বড় কথা বলতে। মনে হল, শকুন যতই ওপরে ডানা মেলুক, দৃষ্টিটা রেখে দেয় মড়া ভাগাড়ে। বলতে থাকল 'আমার অন্যায়টাই দেখছেন আপনি। দেখতে পাচ্ছেন না দিব্যেন্দু মল্লিক এই অফিসে আসছে—পরমুহূর্তে বেপাত্তা। পথে নেমে অঘটন ঘটাবার সম্ভাবনা ওর কি নেই? ছেলেটা সারাক্ষণ মদে মত্ত হয়ে থাকে, খিস্তি খেউড় দেয়।'

—'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও, নিজেকে সামলাও। বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার।'

—'দিব্যেন্দুর কথা বললাম, আরও একজনের কথা আমি বলতে চাই। সুবিমল দাশ অফিসের বিদ্যুৎ চুরি করে চা-টোস্ট-মামলেট-পোচ বানাচ্ছে। ব্যবসা করছে গোটা বাড়িতে। সিনিয়র স্টাফ অনুপাতে মাইনে গুনছে। চা-দুধ-চিনি কিনতে সেও তো কোথায় না কোথায় যাচ্ছে-আসছে। কতজনই অমন করছে। তারা কি পারে না অঘটন ঘটাতে?'

—'সকলকে টানছ কেন হে! যার ক্ষমতা আছে সে দুটো পয়সা কামাচ্ছে। ফুর্তি করছে। এতে তোমারই বা গায়ে লাগছে কেন?'

—'মদ খেয়ে মাতলামো করাকে আপনি ফুর্তি করা বলছেন আর আসল কাজ থেকে সরে-পালিয়ে থেকে পয়সার কুমির হওয়াকে বলছেন 'দুটো পয়সা কামানো'!—অন্যায় সুযোগ নিয়ে পঞ্চাননতলায় তিনতলা দালান হাঁকিয়েছে সুবিমল, বিঘে কয়েক জায়গা জমিও কিনেছে, সে সংবাদ-রাখেন? তা রাখবেন কেন, ফি-রোজ ও যে বিনি-পয়সায় আপনাদের টিফিন খাওয়াচ্ছে। দুর্নীতির পোষক আপনারাই। আপনি পারেন শুধু খাতায় লাল কালির দাগ টানতে, অফিসে কে কখন এল-গেল সেটুকু নোট করতে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এসব কি দেখবার কথা? আপনার আরও করণীয় রয়েছে। আপনার দেখা উচিত কে স্বভাব-পাপী, কারই বা অভাবে স্বভাব নষ্ট। আপনার কাছ থেকে সুবিচার না পেলে কার কাছ থেকে সেটা আশা করব!'

সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন একটু সময়। একের পর এক ওঁর সামনে এসে দাঁড়ায় অফিস পালিয়েরা। ভবনাথ চলে যেতে এলেন শ্রীমতীও। কাল তিনি নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন এক আত্মীয়াকে দেখতে। যাবার সময় সই করে যেতে পারেন নি, সাহেবকে বলে কাজটা চুকিয়ে এলেন।

অন্য সবার মামুলি ছুতো। কেউ বলল—'ঘরে গিয়ে খেলার

রিলেটা শুনলাম স্যার।' - কারও অজুহাত—'টি-ভিতে একটা বই ছিল তা-ই দেখলাম।'

বিরক্তিকর ঠেকে তাঁদের ছেলেমানুষি কথাবার্তা।

হয় না কিছুই। জোর-জবরদস্তিতে সাময়িক অবস্থার হেরফের হলেও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে কোথায়!

*

*   *

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি। এর নড়চড় নেই, ব্যতিক্রম নেই, ঘুম নিদ্রা এসে জুড়িয়ে দেয় শরীর মন, ঘুচোয় ক্লান্তি অবসাদ, জেগে যায় শুভেন্দু রাতের অন্ধকার সরতে না সরতেই। মনের সঙ্গে তাল দিয়ে সাড়া দেয় প্রকৃতির সংসার। বয়ে চলে মুক্তির বাতাস। জটিলতার জট যায় খুলে। এমন অবস্থাটা হয় ছুটির পর অফিসের বাইরে পা ফেলেও।

একটা বিমানের শব্দ ভেসে আসে শেষ রাতের আকাশে, মোরগ ডাকে। পায়রাগুলি বকবকম করে। বাজে এলার্ম দেওয়া ঘড়িটা, কালীমণ্ডপে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে ওঠে শুক্লাদি। খঞ্জনি-করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে যায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী—জাগো জাগো পুরবাসী। প্রভাত সকালে লহ লহ সবে গৌরহরি নামরে। কখনও বা

বল সবে হরিবোল, নিকটে শমন এলো,
ত্যজি অসার সংসার হও অগ্রসর
হরি হরি হরি বোল।
সংসার ত্যজিয়ে মন যাইতে হইবে
বিষয়-বৈভব তোমার সঙ্গে নাহি যাবে,
তখন সার কেবল এই হরিনাম ভাই।

মাগন মাগে পরে একদিন। চাল-ডাল-তেল-আনাজপাতি, পয়সা-কড়িও পায়।

বেলা দুপুরে কমণ্ডলু হাতে আসে সন্ন্যাসীরা—ভিক্ষা পাব মা।

ওরা ভাঙাচোরা মন্দিরটার পাশে কুঁড়ে বেঁধে থাকে, খোল-করতাল বাজিয়ে নাম-গান করে। আসে কেউ-কেউ আশ্রমবাসী সেজে, হাতে বিল বই। ঠাকুরের সেবা-পুজো তো নয়, পেটপুজো। লোকে ফেরায় না। পাল-পার্বণে ঢাকিরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বেড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ; লক্ষ্মীপুজোর দিনে, চৈত্রসংক্রান্তিতে, নীলকণ্ঠপুজোয় ভিগ মাগে গান গেয়ে গেয়ে।

ধর্মের নামে বেসাতি হলেও একটা আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহন করে রাখে তারা।

নিত্যদিনই শুভেন্দুর ঘুম ভাঙিয়ে দেয় বিমানের শব্দটা। হাত-মুখ ধুয়ে স্টোভ ধরায়। ফুলগাছে জল দেয়। ছাদে দাঁড়িয়ে সুর্যোদয় দেখে। লোকজন বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, রাস্তার ধারে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া-অশোক-পলাশ ফুল ফুটে থাকে।

জল-আলো-বায়ু এবং যা-কিছু নয়ন মনোহর, শ্রবণ সুখকর, ঘ্রাণে দেয় সুগন্ধ, আহারে তৃপ্তি, সবই প্রকৃতির দান। সবার অজান্তে কত না নিপুণতার সঙ্গে কাজ করেন দেবী প্রকৃতি। তাঁরই দানে-নিয়ন্ত্রণে ধন্য এই বিশ্বভুবন। অহঙ্কার-দম্ভ করে মানুষ, বুঝতে চায় না সে তার ক্ষুদ্রতার কথা, তার সামর্থ্যের কথা ; বীজ চারা পুঁতে ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকা ভিন্ন তার তো গত্যন্তর নেই।

ঘরে-ঘরে ছেলেমেয়েরা উঠে পড়তে বসে। শুভেন্দুও ডেকে তোলে বাপনকে। চোখ মুছতে মুছতে সে প্রশ্ন করে—"মা তোতায় বাবা ? মা ত্যানো আমাদেল ছেলে ছ্যালো (ছেড়ে গেল) ?'

শুভেন্দু বলে—'তোমার মা আমাদের ছেড়ে যায় নি তো। গিয়েছে স্কুলে, নিজে পড়ছে, ছোট বাচ্চাদেরও পড়াচ্ছে। তুমি যখন আরও বড় হবে তখন মা এসে তোমাকে কত আদর করবে।'

মেয়েদের মতো শুভেন্দু ওকে কোলে-কাঁকালে রাখে, দুধ-রুটি খাইয়ে দেয়। কত কী বলতে হয় ওর বায়না থামাতে—'বাপন তোমার জন্যে আমি সুন্দর সুন্দর ছবির বই নিয়ে আসব, মজার মজার ছড়া ও কবিতা থাকবে তাতে, কত কী আনব দেখে নিয়ো।'

—'তেলনা আনবে না বাবা ?'

—'আনব বাবা, আনব। তুমি যা চাইবে, যেমন যেমন খেলনা আনতে বলবে আমি এনে দেব, এবার শান্ত-শিষ্ট ছেলে হয়ে পড়তে বস তো।'

বাপনকে বই খাতা দিয়ে বসিয়ে রেখে রান্নাটা সেরে নেয় শুভেন্দু। শুক্লাদি নইলে মনীষা এসে নিয়ে যায় বাপনকে। শুভেন্দু যেদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরে ওকে পায় না ঘরে। শুক্লাদি এক একদিন তার ভাইঝিদের সঙ্গে ওকেও নিয়ে যায় কোনও অনুষ্ঠানে, বাচ্চারা যোগ দেয় 'স্পোর্টস' বা 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায়।

পড়ছে কে. জি ওয়ানে, সবে চারবছর পূর্ণ হল। এখনই বাপন ছবি আঁকা শিখেছে। খাতা-স্লেটে ফুল-ফল-জীবজন্তুর আকৃতি দেবার চেষ্টা করে ছবি-চিত্রের বই দেখে দেখে। খেলাধুলোও শিখছে।

*   *

সূর্য ডোবে। সন্ধ্যাবাতি দেবার ধুম পড়ে বাড়িতে বাড়িতে। বৃহস্পতিবারে মেয়েরা পড়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি। মনে পড়ে লিপিকাকে, দেব-দ্বিজে তারও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল।

শুভেন্দুকে একটা শূন্যতা ও নিরাশায় বেড়ে ধরে অফিস থেকে ফিরে এসে, বসে থাকে বাপনের প্রতীক্ষায়। বাপন আসে পাঠ্য-বইয়ের পড়া মুখস্থ করতে করতে। কখনও ছড়া বলতে বলতে ঘরে ঢোকে,—'আপনারে বলো (বড়) বলে বলো ছেই নয়। লোতে যালে

(যারে) বলো বলে বলো ছেই (সেই) হয়।' শুভেন্দুকে দেখতে পেয়ে—'বাবা, ও বাবা, তুমি কতন (কখন) এতেচো ?' বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাপনের মায়ের স্থানটি তুজন মিলে রাথে পূর্ণ করে।

ছেলেকে হোস্টেলে রাখতে চেয়েছিল শুভেন্দু। ছাড়তে চায় নি শুক্লাদি। বলেছে—'বাপন বেবি-ঝুমকির সঙ্গে স্কুলে যাবে-আসবে। পড়াশুনোও করবে একত্রে।'

ছুটির দিনে বাপনের হাত ধরে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ত শুভেন্দু। 'এতা তি, (কি) ওতা তি' বলে মুখে খই ফোটাত, 'বাবা বাঁশ বাগানের মোয়ালছাপ (ময়ালসাপ) তি থায় (খায়) ?' 'তরগোচ (খরগোশ) তোতায় পায় বাবা ?'—'ওলাংওটাং তামলায় (কামড়ায়) না ?' 'ছিংহলাজা (সিংহরশ) ডাতে (ডাকে) তেন ?'

চিড়িয়াখানায় গিয়ে ছেলে নড়তেই চাইছিল না, বাঘ-সিংহ-গণ্ডার-জলহস্তী দেখল।

কত কিছু বলে কত কিছু দিয়ে যে ওকে ভুলিয়ে রাখতে হয়। নকল খেলনা। জীবজন্তুর ছবিতে সব সময় মন ওঠে না। নড়ে চড়ে ; এমন জীবন্ত তাজা সব চাই।

বাপনকে নিয়ে শুভেন্দু কল্যাণী এল। শুভেন্দুও যে পার্ক-বাগান গড়ে তুলছে কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কের ধারে, স্বল্প পরিসরের মধ্যে, খানিকটা এগিয়েছে কাজ।

বাগানের মালি জল দিচ্ছিল বাগানে। শুভেন্দুকে সে দেখাল বহুবিধ ফুলের জাত, গাছ। শুভেন্দু জোগাড় করতে পারে নি ক্যালেণ্ডুলা-বেগেনিয়া-ক্রিসেনথিমাম ফুল গাছগুলি। কিছু ফুলের চারা, ফুল এমনিতেই মালি ধরিয়ে দিল বাপনের হাতে। বাপন তাকেও কত কথা জিজ্ঞেস করল—'দাছের দোড়ায় তেনো (গাছের গোড়ায় কেন) জল ত্তাও ?—দাছ মলে আমলা তেনো মলি না ?'

বাপনের দেখার শেষ ছিল না। বলার শেষ ছিল না। আমগাছে

বউল, গাছে-গাছে রঙিন ফুল, পাখি। নিচে কুকুর-হরিণ। বাপনের দৃষ্টিটা চলে গেল আমগাছের ডালায়। ছা-বাচ্চা নিয়ে যেখানে বসে ছিল হনুমানটা। ও চেঁচিয়ে উঠল—'বাবা ত্যাতো আমাদের হনুমান এচে পলেচে তল্যানি শহলে (কল্যাণী শহরে)। এই হনুমান তলা থাবি ?'

শুভেন্দুর চমক ভাঙল। কী যেন ভাবছিল সে আনমনে। বাপন কলা খাওয়াবে হনুমানকে। শুভেন্দু এনে দিল। কলা খাওয়াতে খাওয়াতে বাপন হাতে তালি দিতে থাকল, এগিয়ে এল আরও ছেলে-মেয়ে। ডুগডুগি বেজে উঠল, কুকুর-বাঁদর-হনুমান-ভাল্লুকের খেলা দেখানো হবে। বাঁদর এসেছে, তাকে কলা না-খাওয়ালে সে কী ভাববে। পয়সা নেই যে। বাপন আবৃত্তি করে—'তলা তিনে (কলা কিনে) বাদলকে খেতে দেব মাগো, একটি পয়সা তুমি দেবে মোলে (মোরে) হাঁ গো।'

'থাক, থাক। মাকে ডাকতে হবে না, আমি তোকে কলা কেনার পয়সা দিচ্ছি বাবা। আগে খেলা-টেলা দেখ।'

পোষা জন্তুরা কখনও নেচে, কখনও ডিগবাজি খেয়ে খেলা দেখাতে থাকল। জন্তুপশুরাও মানুষের বশ হয়, কেমন কথা শোনে। দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, নাচছে, সেলাম জানাচ্ছে।

খেলা শেষ হল। লোক আসছে, যাচ্ছে। হঠাৎ-ই শুভেন্দুর চোখ ঘুরে গেল একজনের দিকে, ওর পাশেই বা কারা ?

'বাপন, এই বাপন' বলে ডাক দিল লিপিকা। মায়ের ডাকে বাপনও সাড়া দিল, কাছে গেল এগিয়ে। 'মা, বালি তলো (বাড়ি চল), ত্যাতো ততো বলো হয়েচি আমি।'

এক ঝটকায় লিপিকার হাত থেকে বাপনকে ছিনিয়ে নিয়ে এল শুভেন্দু। পার্ক-বাগানের ছকটা করা হয়ে গিয়েছিল। চারা গাছও জোগাড় হয়েছিল কয়েকটি। এবার ফেরবার পালা।

বাপনকে কোলে তুলতেই বায়না ধরল—'মাল তাছে দাবো (কাছে যাব) বাবা!'

শুভেন্দু হাঁটা ধরল ছেলেকে আদর করতে করতে।

ওদের চলে-যাওয়া পথের দিকে লিপিকা তাকিয়েছিল বাষ্পাচ্ছন্ন নিষ্প্রাণ চোখে।

সঙ্গে তার স্কুলেরই দুজন শিক্ষিকা। তাদের উদ্দেশ করে লিপিকা বলল—'বাপনকে লোকটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তোরা বাধা দিতে পারলি না?'

একজন জানাল—'তোর জিনিস তুই যখন আটকে-বেঁধে রাখতে পারলি না, আমরা কী করব?'

—'আমার জিনিস সে তো ঠিকই, কিন্তু—'

—'কিন্তু কেন রে! যাকে দেখে-শুনে নিজেই বরণ করে নিয়েছিলি, তাকে এলি কেন ছেড়েছুড়ে। ভদ্রলোকের কী অপরাধ?'

—'তোরা ও-রসে বঞ্চিতা। আমি সে-কথা বলে বোঝাতে পারব না। কোনদিনই চালাক-চতুর ছিলাম না। যে ডাকত শুনতাম তার ডাক—কে জানত, ও-যে পশুর অধম হয়ে উঠবে। জঙ্গলের পশু-পক্ষীদেরও ধৈর্য-সহনশীলতা আছে রে—'

অন্য মেয়েটি বলল—'তুই কী বলতে চাইছিস, লোকটা তোকে ভাল না বেসে মারধর করত কি?'

—'বলে লাভ নেই। বিয়ে-থা কর, তখন বুঝবি। জানিস, বিয়ে না-করে থাকা যায়, একবার করে ফেললে ছাড়াটা দুঃসহ। আমি মা হয়েছি। গর্ভে সন্তান ধরলেই মায়ের কর্তব্য ফুরিয়ে যায় না। এক-একবার ভাবি যাব আমি। বাপনের মুখ চেয়ে যাব। তবে ওর বাবার হাতের পুতুল হয়ে আর নয়।'

—'তা হলে আবার তুই চাকদায় ফিরে যাবি?'

—'এতদিনে সুবুদ্ধিটা যখন হল, ভদ্রলোককে জানিয়ে দিয়ে আসি—'

—'তোদের ব্যস্ত হতে হবে না, সময় হলে বাপনই নিয়ে যাবে

আমাকে। ও-তো জানল, আমি আছি, আমি ওরই থাকব। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল লিপিকা।

ওর বান্ধবী রূপালী বৈশাখী হতবাক। গাছপালা-জীবজন্তু-প্রকৃতি মিলে-মিশে এই যে অপূর্ব সংসার—তারই পরিচয় নিতে এসে, দেখতে এসে, যা দেখল-শুনল তা অভাবিত-অপ্রত্যাশিত। পেটের ছেলেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে দিয়ে তাকে ফের কাছে পেতে লিপিকা আকুল হয়ে উঠল। যাবে তো ও চলেই যাক না বরের কাছে। লোকটা বাঘ ভালুক তো নয়।

*

* *

শুভেন্দু বাপনকে নিয়ে ঘোষপাড়ায় এল—যেখানে "সতীমায়ের বাড়ি", দোল পূর্ণিমাতে মেলা বসে। বাপন কখনও কোলে উঠল, কখনও হেঁটে-ছুটে বেড়াল। হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। রয়েছে তাতে ফুলের চারা ও কয়েকটা ফুল।

বাপন জামা-প্যান্টের পকেট থেকে ফুল বের করে দেখায় শুভেন্দুকে। বলে—'ছুতো (সুতো) দিয়ে মালা গেঁথে পলাব আমি তোমাল আল (আর) মাল (মায়ের) ফতোতে।'

—'না বাপন, ফুলদানিতে ফুল রাখবে। মানুষ বেঁচে থাকতে ফটোতে মালা পরাতে নেই।'

—'থাতুরের (ঠাকুরের) ফতোতে মালা পলাতে হয়?'

—'হ্যাঁ, বাড়িতে টাটকা বেলফুল আছে, গিয়েই মালা গাঁথা যাবে। এ-ফুল নিয়ে যেতে যেতেই তো শুকিয়ে যাবে।'

—'দাচ মলে যাবে না বাবা?'

—'গোড়ায় মাটি দেওয়া আছে যে, মরবে কেন!'

ওরা ডাউন সীমান্ত লোকালে চেপে নামল এসে কল্যাণীতে। ছুটো

স্টেশন পেরোলেই চাকদা। ঘরে ফিরতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে!

বাপ বেটা কথা বলতে বলতে ঘুরপাক দিতে থাকে স্টেশন চত্বরে। ভবনাথদার সেই চাঁদমারী স্টেশন, গুদামঘর ঠিক কোনখানে ছিল তা কে জানে? অচেনা-অজানার সন্ধানে নাই বা পা বাড়াল এই পড়ন্ত বেলায়। বাপনও হাঁটাহাঁটি করতে চায় না। এক-একবার মনেও করিয়ে দিতে থাকে 'গালি-টেলেন ছেলে দেবে। বালি যেতে পালব না।'

প্ল্যাটফর্মে উঠেই অবাক হবার পালা।

শুভেন্দু বলল—'বাপন তোমার পিসি আসছে দেখ!'

দেখেই ও দিল এক ছুট। বর্ণালীর গায়ে গিয়ে পড়ল—'পিচি, ও পিচি। তুমি আমাদেল বালি যাবে না?'

থমথম করছিল বর্ণালীর মুখখানা। খোঁপা থেকে এলিয়ে পড়েছিল বিনুনি। কিছুটা বিধ্বস্ত-বিবর্ণ চেহারা। অফিসে দেখা হল, কথাও হল গতকাল। কই, বলল না তো আজ কল্যাণীতে আসবে।

বর্ণালী জানাল 'শুভেন্দু তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা। এস, ঘাসটার ওপর বসি। কখন থেকে লক্ষ্য করছি তোমরা উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম করে বেড়াচ্ছ। ছেলেটা যে পেরে উঠছে না সেদিকে খেয়াল আছে?'

—'আমাদের দিকে পরে নজর দেবে। আগে বল কী খবর? তোমাকে অমন লাগছে কেন?'

ঘাসের উপর নয়। কিছুটা এগিয়ে ওরা বেঞ্চিতে বসল, মাঝখানে বাপন।

—'ছুটির দিনেও তোমাকে যে ঘরে পাব না বুঝিনি। শুনলাম তোমরা কল্যাণীতেই এসেছ—ফিরতি ট্রেনে এখানেই নামলাম।—তোমার ওপর যা রাগ হচ্ছিল! এক-এক সময় আমার কি মনে হয়

জান, গত জন্মে আমি তোমার শত্রুই ছিলাম, এ জন্মে তা-ই শত্রুতা শোধ করলে।' বর্ণালীর কথায় ঝাঁজ।

— 'ঝগড়ুটেপনা রেখে যা বলবে সোজাসুজি বল বর্ণালী। এমন পরিবেশে তুচ্ছ কলহ-দ্বন্দ্ব, স্বার্থ-চিন্তা বেমানান। জান, সার্কাস দেখলাম কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কে। যা দেখব ভাবিনি, তা-ও দেখলাম। পেলাম কিছু ফুলের চারাও। এরপর চাকদায় গেলে দেখতে পাবে আমার ঘরের পাশে আর এক "জল-বায়ু-কানন"।'

বর্ণালী চুপ করে থাকে। কী বলবে না-বলবে হয়তো ভাবে। বাপন হুড়বড়িয়ে কত কী জাহির করে নিজস্ব ভাষায়। কিছু কথা দুর্বোধ্য ঠেকলেও তাতে ও সাড়া দেয়। তবে হাসে না।

আকাশে মেঘ জমলে, মেঘ কেটে গেলে সহজে তা দেখা যায়। মনের মেঘের কিনারা পেতে সময় লাগে। কখন সে মেঘে ঝড় বয়, বর্ষা নামে। কজনেই বা তার খোঁজ রাখে! পুরুষ-নারীর প্রেম যেন উড়ো মেঘের খেলা, এই আছে—এই নেই। অমিলে মিল ঘটানও শক্ত। বিবাহবাসরে দম্পতি প্রতীকী শোলার পুতুলকে জোড় বাঁধিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আসল নর-নারী পরস্পরে নিবেদন সমর্পণ না করলে, মিল যুক্ত না-হলে কিছুই যে করবার থাকে না।

শুভেন্দু বলে—'তোমার প্রকৃত রোগটা আমি ধরে ফেলেছি। যাকে পেয়েছ এতদিনেও তুমি তাকে বশে আনতে পারলে না!'

—'বশে-বাগে আনবার প্রশ্ন নয়। অবশ-অসাড়-অবসাদেরই প্রশ্ন। তোমাকে কেমন করে বলে বোঝাব সে-সব। সমস্যা কি একটা? ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে তোমার পাড়ার উকিল বাবুটির কাছে যাব, কাল তো অল্পের জন্য মলয় একটা দুর্ঘটনা হতে-হতে বেঁচে গেছে। অফিস ছুটির পর এগোচ্ছিল বাসস্টপের দিকে। আলটপকা গায়ে এসে ধাক্কা মারে একখানি প্রাইভেটকার, পড়ে যেতেই ধরে তোলে রাস্তার লোক। গাড়ির নাম্বারটা পাওয়া গেছে, দিব্যেন্দুরই গাড়ি—'

—'ছেলেটা বড় বাড় বেড়েছে। ওকে শায়েস্তা করতেই হবে। কোর্ট উকিলের প্রয়োজন নেই, তোমাদের জন্যে একজন ডাক্তারকেই বরং ডাকব।'

—'আমি সুস্থই আছি। মলয় শুধু অসুস্থই নয়। ওকে বলতে পার দুর্বল, অচল, ভীতুও অনেক রকম বিশেষণেও ওকে ভূষিত করা যায়। অন্য কেউ হলে অমন ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে উঠত, মুখিয়ে যেত ড্রাইভারের দিকে। দয়া দেখিয়ে দিব্যেন্দু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা বসায় নি। সাময়িক আমাকে সমস্যায় ফেলতে চেয়েছিল।'

—'সে যা-ই-করতে চেয়ে থাকুক ওকে এবার উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব আমি। যাকগে, অফিসের আলোচনা অফিসেই করা যাবে। আর কি খবর বল। আমি তোমার সঙ্গে কী শত্রুতা শোধ করলাম, বল তো?'

—'বিয়ে-থা না করে বেশ তো দিন কাটছিল, কেটে যেতও। যাকে তুমি এনে দিলে সে যদি পুরুষের মতো পুরুষ হত! দুঃখটা আমার কোথায় সেটা জান না। গাছ পুঁতলে ফুল-ফলের আশা-প্রত্যাশা থাকে। যদি ফুল ফোটার আগেই সে গাছ লুটিয়ে ঢলে পড়ে, তখন কেমন লাগে চিন্তা কর তো?'

সেবা-যত্ন-দরদ ও ভালবাসার ছোঁয়া দিয়ে লতিয়ে-পড়া গাছকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ফাটল দেখা দিলে তাকে সারানো সম্ভব হয় ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা। ভুল বোঝাবুঝির অবসানও হয়।'

—'খুব তো উপদেশ দিচ্ছ আমাকে, প্রেম-ভালবাসা-ত্যাগ-তিতিক্ষার এতই যখন ক্ষমতা তখন তুমিও বা হার মানলে কেন!'

—'সে তো তোমাকে আমি বলেছি। আমার খুঁত-গলতি ছিল মানসিক ভাবধারায়; উচ্ছৃঙ্খল মাত্রাজ্ঞানহীনও হয়ে পড়েছিলাম। এখন বুঝছি মানুষের সেরা সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। সে সম্পর্ক দৃঢ়-গাঢ় হয়ে ওঠে উভয়ের প্রেম-প্রীতির বিনিময়ে—যা পেলে আকাশের তারা-

গুলো হয়ে ওঠে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। সবুজ-সুন্দর শ্যামলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে শুকনো শীর্ণ গাছও; পাখির কুজন কাকলি, সন্ধ্যার শিউলি, রাতের রজনীগন্ধা শব্দে-ঘ্রাণে-অনুভূতিতে-ভিন্নতর অপূর্ব সাড়া জাগায়—'

কথা থেমে গেল। লিপিকা-বৈশাখী-রূপালী দাঁড়াল এসে শুভেন্দুও বর্ণালীর সামনে। যাবে তাহেরপুর। বাপন 'মা-মা' বলে বেঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই লিপিকা টেনে নিল কাছে। শুভেন্দুর দিকে একবার পলক ফেলল। বলল—'বেশ তো চলছে। কাছ থেকে সরে যেতেই চেয়েছিলাম, পারলাম না বাপনকে দেখে।'

রূপালী বলে উঠল—'জলজ্যান্ত বউ থাকতে আর একজনকে জুটিয়ে এনে কাজটা ভাল করেন নি।'

বৈশাখী বলল—'তখন দেখে তো বোঝাই গেল না, এভাবে আপনি লুকোচুরি খেলতে পারেন! আমরা জানতে চাই আপনি কাকে ছাড়বেন, কাকেই বা রাখবেন।'

জবাবটা বর্ণালীই দিল—'আপনারা মিছেই ভাবছেন দিদি। এতদিন শুভেন্দু যাঁর স্বামী ছিল তাঁরই রয়েছে।'

বাপন মায়ের কোলে চড়ে বুকের সঙ্গে লেপটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে সে-ও জানিয়ে দিল—'ওতো আমাল পিচি, দমদমার পিচি।'

জলের মাছ, ডাঙার পশু-জন্তু, শূন্যচারী পাখি কেউ-ই চায় না তাদের ছা-বাচ্চাকে কোল-ছাড়া করতে। লিপিকাও চাইল না। পার্কে তখন পেয়েও পায় নি। না-পাওয়ার সেই কষ্টটা যেন পুষিয়ে নিল সুদে-আসলে; আদর করল, চুমু খেল।

বৈশাখী-রূপালী কি যেন বলল লিপিকার কানে কানে। একটা ট্রেন আসতেই দুজনে চলে গেল।

মলয়কে দেখা যায় আসতে। মলয় বর্ণালীর সঙ্গেই এসেছে। বসেছিল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে। হাতের ইশারায় ডাকতেই ও এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এল কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে। সামান্য খোঁড়াচ্ছিল, ঘাড়ে-

পিঠে ব্যথা, পায়ের গিঁটেও কনকনানি রয়েছে। বর্ণালী ওকে দেখিয়ে বলে—'ইনিই হচ্ছেন আমার ইহকাল-পরকালের জন। আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারেন না।'

বর্ণালী-মলয়-শুভেন্দু দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। লিপিকার এক হাতে বাপন অন্য হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা। সে নিজের ঘরে ফিরে যাবে, নতুন করে বাঁচবে, চোখে-মুখে তা-ই সুখ-স্বপ্ন রেখা।

লাল সিগনাল হলুদ হল, সবুজ হল—দুদিকেই যাবার ট্রেন আসছে।

শুভেন্দু বলে—'সম্পূর্ণ সুখ কারও পাবার সাধ্য নেই, সিন্ধুর স্বপ্ন বিন্দুর মধ্যেই দেখতে হবে আমাদের।'

বর্ণালী মলয়কে ধরে নিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে আসে। আপ লাইনেও এসে পড়ে ট্রেন। যে যার ট্রেনে উঠে যায়। ইঞ্জিনের হর্ন বাজে। যেন শাঁখের আওয়াজ। অন্ধকার পথে আলো দেখাতে দেখাতে দুটো ট্রেন ছুটে চলে। সেই গতি-ছন্দের তালে তালে কত কথাই না ধ্বনিত হয়। বোধহয় কেউ বলে—সময়টা এগোয়-পিছোয়—জীবনটা দেখতে দেখতে ফুরোয়, তবে আর থামা নয়—থামা নয়।

———